অবরোধ

এই লেখকের ঃ

॥ উপন্যাস ॥

ইরাবতী (২য় সং)

আরাকান (২য় সং)

উপকূল (২য় সং)

অন্যতমা (২য় সং)

নারী ও নগরী (২য় সং)

বনকপোতী

মৃত্তিকার রং

পূর্বরাগ

॥ গল্পগ্রন্থ ॥

সুরবাহার (২য় সং)

প্রান্তিক

সপ্তকন্যার কাহিনী

স্বপ্নমঞ্জরী

মৃগশিরা

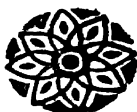
পঞ্চরাগ

শঙ্খলিপি

অবরোধ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ
২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা-৬



প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬৫

প্রকাশক—কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য জগৎ
২০৩/৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট ব্লক—
ব্লকম্যান (প্রসেস)

মুদ্রাকর—ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

তিন টাকা

ঃ উৎসর্গ ঃ

॥ বাংলাদেশের কাজলদের
পরিশ্রমের ঘামে যাদের
প্রসাধনের টিপ
মুছে যায় ॥

সকাল থেকে পরাশরবাবুর পরিশ্রমের অন্ত নেই। ছুটোছুটি করে পায়ের স্নুতো ছিঁড়ে যাবার দাখিল। ডাক্তার ডাকা, দাইয়ের খোঁজ করা, দশ রকমের ওষুধ পত্র, প্রাণান্তকর ব্যাপার। এর ওপর আবার নিজের বুকের ধুকপুকুনি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে নবতারার যন্ত্রণা কাতর মুখের ছবি। পাংশু, বেদনায় নীল।

ভালোয় ভালোয় সব কিছু মিটে গেলে পরাশরবাবু বাঁচেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

সাড়ে তিনখানি ঘর। লোক বলতে অবশ্য দুজন। নিজে আর পরিবার। আপদে বিপদে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পরাশরবাবুই ভরসা। এমন একটা অবস্থায় একটু নাজেহাল হ'য়ে পড়েছেন। হিসাব করে শ্রীরামপুর থেকে বড় শালীকে এনেছেন। দিন কয়েকের জন্য।

খবর সেই শালীই আনল।

মুখুজ্জে মশাই সন্দেশ খাওয়ান।

আচমকা গলার আওয়াজে পরাশরবাবু চমকে উঠেছিলেন। ব্যাপার কিছুটা আঁচ করেছিলেন কিন্তু ভয়ে ভেতরে যেতে পারেন নি। ঠিক ভয় নয়, ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ সব মিলিয়ে বিচিত্র এক অনুভূতি। পরাশরবাবু চোখ বুজে বিঁড়ি টানছিলেন, শালীর কথায় চোখ খুললেন। আস্তে বললেন, কি হ'ল।

মেয়ে। তা হোক প্রথম মেয়ে হওয়া খুব ভাল। বাপের পরমায়ু বাড়ে।

অবশ্য মেয়েতে পরাশরবাবুর এমন কিছু দুঃখ নেই। মেয়ে হোক,

ছেলে হোক, একই কথা। শুধু নবতারার নির্বিঘ্ন প্রসবই তাঁর কাম্য। নবতারা সেরে উঠুক। তার কষ্টের লাঘব হোক।

পরাশরবাবু উঠে দাঁড়ালেন, দেখে আসি একবার?

তাড়া কিসের? একটু পরেই না হয় দেখ। বড় শালী বাধা দিল।

লজ্জা পেয়ে পরাশরবাবু বসে পড়লেন। এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, ওর শরীর কেমন? আর কষ্ট নেই তো?

বড় শালী মুখ টিপে হাসল, কে নবু? ভালই আছে।

কথা টথা বলছে? পরাশরবাবু গলা একটু চড়ালেন। কোন উত্তর নেই, পিছন ফিরে দেখলেন বড় শালী সরে গেছে চৌকাঠ থেকে।

একটু পরে পরাশরবাবু উঠে পড়লেন। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন আঁতুড় ঘরের দিকে। ধারে কাছে কেউ নেই। তবু পরাশর-বাবু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখলেন। বড় শালীর চোখে পড়লেই সর্বনাশ। এখনি ঠাট্টা শুরু করবে। ছড়া কাটবে ইনিয়ে বিনিয়ে। না, বড়শালী রান্নাঘরে। এখান থেকে তার দেহের কিছুটা দেখা যাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে শুধু দাই। প্রৌঢ়া, তাকে আর লজ্জা কিসের!

পরাশরবাবু জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে আঁতুড় ঘরের দিকে নজর চালালেন। স্যাঁতসেঁতে ঘর। কাঠ কয়লা, ভাঙাচোরা টিন, দুনিয়ার যত আবর্জনা রাখার জায়গা ছিল। রাতারাতি পরিষ্কার করে নবতারার জন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

দাই এদিকের দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছে। নবতারা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মিট মিটে আলো, কিন্তু দেখতে পরাশরবাবুর কোন অসুবিধা হল না।

নবতারার কোলের কাছে ছেঁড়া কাপড়ের ওপর নবজাতা। রঙ যেন জমাটবাঁধা অন্ধকার। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। রঙই শুধু মিশকালো নয়, নাকমুখেরও কোন বাহার নেই।

অবশ্য সদ্যোজাত অবস্থায় সঠিক কিছু বলা মুস্কিল, কিন্তু গোল চোখ, নাকের বালাই নেই, পুরু কালো ঠোঁট।

পরাশরবাবু নিশ্বাস ফেলে সরে এলেন।

অথচ এমনটি ঠিক হবার কথা নয়।

নিজে কন্দর্পকান্তি না হলেও পরাশরবাবুর চলনসই চেহারা। স্ত্রীও খুব নিন্দার নয়। বাঙালীর ঘরে সাদামাঠা যেমন হয়। পরিষ্কার শাড়ি ব্লাউজে, ঈষৎ টানা চোখে, পানের রসে লালচে ঠোঁটে, কপালের মাঝখানে সিকি-সাইজ সিঁদুরের টিপে, টান করে বাঁধা খোঁপায় ভালই দেখায় নবতারাকে। পরাশরবাবু নিজে পছন্দ করে নিয়ে এসেছিলেন।

শুধু মাঝামাঝি রূপই নয়, গতরও খুব। সারা সংসার মাথায় করে রেখেছে। জ্যাকসন কোম্পানির কনিষ্ঠ কেরানী। ঠাকুর চাকর রাখবার মতন অঢেল মাইনে পান না। নবতারা একলাই সব করে। এক হাতে।

কিন্তু প্রথম মেয়ে যে এমন হবে, এ যেন ধারণারও বাইরে।

সেই যে পরাশরবাবু মুখ ফিরিয়েছিলেন, আজও পর্যন্ত মেয়ের দিকে সোজাসুজি চাইতে পারেন না।

অবশ্য বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু চেকনাই এসেছে শরীরে, ওরই মধ্যে মাজাঘসা করে চলনসই হবার প্রয়াস। কিন্তু সত্যিই বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। চ্যাপ্টা নাক, কুতকুতে চোখ, রঙ অমাবস্যাকেও হার মানানো।

আরো দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে তারপরে, কিন্তু কাজলের মতন কেউ নয়।

চেহারার যা দোষ, কিন্তু মেয়ের গুণ অনেক। ঝামেলা নেই, বায়না নয়, খাওয়া আর ঘুম, ব্যস। সংসারে আর কিছু প্রয়োজন নেই কাজলের, আর কাউকে নয়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা গুণ দেখা দিল। ছেলে-

বেলা থেকে কিছুটা আন্দাজ করা গিয়েছিল। অসাধারণ মেধা। একবার কিছু একটা শুনলে আর ভোলে না।

পাড়ার কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেশবার উপায় ছিল না। ওর রঙের সঙ্গে মিলিয়ে তারা অদ্ভুত সব ছড়া তৈরি করত। ডাকতও বিশ্রী সব নামে। ঠোঁট ফুলিয়ে কাজল ঘরের কোণে পালিয়ে আসত। নালিশ নয়, কাউকে কোন কথা নয়, চোখের জল মুছে চুপচাপ বই নিয়ে বসত। যে কোন বই হোক। বসে ছবি দেখত কিংবা বানান করে পড়বার চেষ্টা করত।

কতই বা বয়স, কিন্তু এই বয়সেই কাজল ব্যাপারটা ঠিক বুঝে নিয়েছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের রূপহীনা মেয়ে। এমনি অনাদর আর অবজ্ঞার পাহাড় ঠেলে তাকে বড় হতে হবে। মানুষ হতে হবে সকলের ভ্রুকুটি আর উপেক্ষা ডিঙিয়ে।

বিদ্রূপের শরাঘাত থেকে বাঁচবার জন্য কাজল নিজের পড়ার ঘরে আশ্রয় নিল। ব্যূহরচনা করল বইয়ের স্তূপ দিয়ে। এ প্রাচীর পার হয়ে কারুর দৃষ্টি যেন না ঠেকে নিজের মসীবর্ণ ত্বকে, অসুন্দর মুখের দিকে।

অবশেষে পরাশরবাবুকে সত্যি সত্যিই মুখ তুলে একদিন চাইতে হ'ল মেয়ের দিকে। না চেয়ে উপায়ও ছিল না।

কাজল ম্যাট্রিক পাশ করল জলপানি পেয়ে।

খবরটা নিয়ে কাজলই এগিয়ে গিয়েছিল বাপের দিকে। একগাদা প্রাইজের বই বুকে জাপটানো। হাতের মুঠোয় ঝকঝকে রূপোর মেডেল।

বাজারের হিসাব দেখার ফাঁকে পরাশরবাবু মেয়ের দিকে চোখ ফেরালেন।

মাজাঘসা যতই করুক, চোখ মুখের গড়ন যাবে কোথায়। মিশমিশে কালো রঙ একটু খসখসে হয়েছে। এই বয়সে কোথায়

লাবণ্যে টলমল করবে মেয়ে। গড়ন হবে সবুজ সতেজ বাড়ন্ত পুঁই-ডগার মতন। কিন্তু এ মেয়ের সে সব কিছু নয়। সামান্য একটু চিক-চিকে ভাব। এই মেয়ে পার করতে পরাশরবাবুর অবস্থা কাহিল।

ভাবতেও তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। পুঞ্জীভূত অন্ধকার চোখের সামনে। একশো বিরাশী টাকা মাইনের কেরানীর ঘরে এ তো মেয়ে নয়, মাছের কাঁটা। তেরচাভাবে গলায় আটকে থাকে। ওঠেও না, নামেও না। অথচ নড়তে চড়তে গেলেই প্রাণান্তকর অস্বস্তি।

কাজলের কথায় পরাশরবাবুর চমক ভাঙল, আমি কলেজে পড়ব বাবা।

কলেজে? বেশ তো, তা পড়ুক না। বাপের ঘাড়ে তো আর ঝক্কি নেই, কোন ঝামেলা নয়। মেয়ে নিজের পয়সায় পড়বে। বাপের কাছে হাত পাততে হবে না।

কিন্তু ওই এক চিন্তা। পড়াশোনারও তো শেষ হবে একদিন। চিরদিন তো চলবে না। তারপর? বয়স আরো বাড়বে মেয়ের। তখন পাত্র পাওয়াই দুষ্কর হবে। তাছাড়া বি-এ, এম-এ পাশ করা মেয়েকে যার তার হাতে দিতে গেলে সেও হয়তো বেঁকে বসবে। সেরকম শিক্ষিত ছেলে চাইবে। কিন্তু ওই শ্রীতে পাত্র জোটাই দায়, তা আবার সুপাত্র!

সে সব অবশ্য পরের কথা। এখন পড়া ছেড়ে মেয়ে বাড়িতে বসে থাকলে জলপানির টাকা কটাই মাটি। তার চেয়ে পড়াশোনা চলুক। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে না হয় বিয়ের চেষ্টা চলবে। ঘটক লাগিয়ে এদিক সেদিক খোঁজ খবর। দুবেলা দুমুঠো ভাত, আর পরণের মোটা কাপড়, এই হলেই যথেষ্ট। তার বেশি আর দেখবার দরকার নেই। অবশ্য তার বেশী দেখতে হ'লে যে বাড়তি চাঁদির প্রয়োজন জ্যাকসন কোম্পানির ছাপোষা কেরানীর সেটারই একান্ত অভাব।

কিন্তু পড়াশোনা যে অনুপাতে এগোল, বিয়ের কথাবার্তা সে

অনুপাতে নয়। কালেভদ্রে দু'একজন আসেন। ঘটকদের প্রায় হাতে পায়ে ধরাধরির পর।

ওই আসাই সার। মেয়ের চেহারা দেখেই জলখাবারের থালা থেকে হাত গুটিয়ে বসেন। দ্বিতীয় কথাটি নয়। কিংবা কখনো কখনো বাঁধা বুলি। পরে খবর দেবেন—এই বলে সরে পড়েন। কেউ কেউ খবর দেন, পোস্টকার্ড মারফৎ। সবিনয় নিবেদন দিয়ে শুরু, শেষ করেন মেয়েকে অপছন্দ হবার সংবাদটুকু দিয়ে। অনেকে আবার বাড়তি আর এক লাইন লেখেন। মেয়ে সুপাত্রস্থ হোক এমন কামনা জানান। অনেকেই লেখা-লেখির মধ্যে যান না। পান চিবোতে চিবোতে পরাশরবাবুর মুখের ওপরই বলে যান, মাপ করবেন মশাই, চোখে দেখে এমন মেয়ে কেউ ঘরে তুলবে না।

পরাশরবাবু আমতা আমতা করেন, মানে মেয়ের রঙ একটু কালো, তবে মেয়ে আমার খুব গুণের।

থামুন মশাই, পরাশরবাবুরই দেওয়া সিগারেটে টান দিতে দিতে তাঁরা উত্তর দিয়েছেন, আরে কালো মেয়ে আমরা অনেক দেখেছি, নিজেরাও কিছু ইংরেজ নই, তাদের তবু শ্রী আছে, এ একবারে হুঁ,—

কথা শেষ না করেই তাঁরা চলন্ত বাসে উঠে পড়েছেন। পরাশরবাবু হাঁ করবার সুযোগ পান নি।

কাজল বি-এ পাশ করল আর বিপদটা ঘটল ঠিক পাশ করার মুখেই।

এমনিতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ির ছোট কাঁটা দশটা ছুঁই ছুঁই। অফিসে আবার এক জাঁদরেল ফিরিঙ্গি ম্যানেজারের চেয়ারে। একটু দেরী হলেই নামের পাশে লাল ঢেরা। তিন দিন দেরীতে একদিনের মাইনে খতম। পরাশরবাবু তাড়াহুড়ো করে জর্দার ছিটে দেওয়া পান মুখে দিয়েই ছুট। ছুটেই কি রেহাই

আছে। টিপ টিপ বৃষ্টি। কাদা বাঁচিয়ে সাবধানে পা ফেলা। নাকে চোখে বৃষ্টির ফোঁটা। নাজেহাল অবস্থা।

ধুতি সামলে বাসে উঠতে গিয়েই বিপত্তি। হাতল ফসকে পরাশরবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একেবারে রাস্তার ওপর। হৈচৈ, চীৎকার। একটা পায়ের ওপর দিয়ে পিছনের চাকাটা সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে থামল দশ গজ দূরে।

লোকেরা মারমুখো। ড্রাইভার, কণ্ডাক্টরকে খুনই করে ফেলবে। ওরই মধ্যে কয়েকজন বিচার বিবেচনা করে ট্যাক্সি ডেকে পরাশর-বাবুকে তুলে নিয়ে গেল হাসপাতাল। বাড়িতে খবর এল ঘটনার ঘণ্টা দুয়েক পরে। ওদেরই একজন পরাশরবাবুর পকেটের কাগজপত্র হাতড়ে বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করেছিল।

মাসখানেক ডাক্তারেরা এক একদিন এক একরকম খবর শোনাল। প্রথম কয়েকদিন প্রাণের আশ্বাস দিল না। সব ভবিতব্য। নবতারাকে বুক বাঁধবার ইঙ্গিত। তারপর ভরসা দিল অল্প অল্প করে। হয়তো বেঁচে যাবেন এ যাত্রা, তবে ওই ডান পায়ের বদলে।

নবতারা দুটো হাত জড় করল বুকের ওপর। প্রার্থনার ভঙ্গীতে। তাই হোক দয়াময়, প্রাণে বাঁচুক মানুষটা। একঘর ছেলেপুলে। এক পয়সা আয় নেই। রোজগারের লোক ওই একটি। উপুড় হস্ত করার মতন কোন আত্মীয় নেই। মানুষটা সরে গেলেই সর্বনাশ। অথৈ জল চারদিকে। আঁকড়ে ধরার মতন কুটোও কোথাও নেই।

পা গিয়ে যত না বিপদে পড়েছিলেন পরাশরবাবু, তার চেয়ে বেশী বিপদে পড়লেন চাকরি গিয়ে। ক্রাচে ভর দিয়ে দশটা পাঁচটা অফিস করার চেষ্টা তিনি করতে চেয়েছিলেন, ভিড় বাঁচিয়ে কোনরকমে আসা যাওয়া, কিন্তু ডাক্তারেরা বারণ করলেন। অন্ততঃ মাস চারেক চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে বিছানায়। নড়াচড়া চলবে না। কোমরের চোটটা না সারলে কিছু করা উচিত হবে না।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, পাগল না ক্ষ্যাপা। এই হুড়োহুড়ির দিনে হুপায়েই মানুষ কুল পাচ্ছে না, আর একটা পায়ে ভর দিয়ে ট্রামে বাসে চলাফেরা কম বিপদ। আর একবার বেকায়দায় কিছু একটা হয়ে গেলে হাসপাতাল অবধি পরাশরবাবুকে আর পৌঁছতে হবে না। তার চেয়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ক'টা তুলে নিয়ে চলুক যদিন যায়। ঘরে এমন পাশকরা মেয়ে থাকতে পরাশরবাবুর ভয়টা কিসের! দরকারের সময়ই যদি কাজে না এল তো টাকা পয়সা খরচ করে, এত মেহনত করে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে লাভ! বিপদে আপদে বুক দিয়ে পড়বে বলেই তো।

পাশকরা মেয়ে! বালিশে ভর দিয়ে পরাশরবাবু কাজলের দিকে মুখ ফেরালেন। এতদিন পরে প্রথম চাইলেন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে।

জানলার ধারে একটা চেয়ারে কাজল বসেছিল। হুটো হাত কোলের ওপর। আবছা অন্ধকার। নিকষ কালো রঙে ব্রোঞ্জের আভাস। বাপের বন্ধুদের কথার সবটাই কানে গিয়েছিল।

ঘর খালি হতেই পরাশরবাবু মেয়েকে কাছে ডাকলেন। এই প্রথম। কাজল আস্তে আস্তে এগিয়ে বাপের বিছানার সামনে দাঁড়াল। পরাশরবাবু কিছু বলবার আগেই শান্ত গলায় বলল, আমি সব শুনেছি বাবা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

পরাশরবাবু হয়তো নিশ্চিন্ত হলেন, কিন্তু কাজলের হুশ্চিন্তা বাড়ল। পাশ করা ওর কাছে যত সহজ ঠেকেছিল, চাকরি পাওয়াটা সেই পরিমাণে কঠিন মনে হল। পরীক্ষার সময় পরীক্ষকদের সামনে যেতে হয়না, যত কিছু কারসাজি তার খাতা নিয়ে। মানুষটাকে বাদ দিয়ে শুধু মেধার বিচার।

কিন্তু চাকরির বেলা ঠিক উল্টো। মানুষটার ওপরই যেন নজর বেশী। পাশ করার সনদগুলো পাশে সরিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আবেদনকারিনীকে দেখা। পাত্রী যাচাই করা চোখ নিয়ে শরীরের গড়ন, চোখ মুখের ছিরি ছাঁদ, গায়ের রঙ, এক কথায় চলন বলন সব কিছু পর্যবেক্ষণ।

মাস ছয়েক বহু ঘোরাঘুরি আর ধরাধরির পর শিকে ছিঁড়ল। মেয়েস্কুলের মাস্টারী। ষাট টাকা মাইনে, মাগ্‌গী ভাতা দশ। তবে ভরসা, বি-টি পাশ করতে পারলে বরাত খুলে যেতে পারে। তাই সই। ডুবন্ত মানুষের কাছে খড়কুটো। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে শুধু বি-টি নয়, কাজল এম-এ'ও পড়তে আরম্ভ করল।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা সংসারের কাজে যত না লাগল, তার চেয়ে বেশী লাগল পরাশরবাবুর চিকিৎসায়। কোমরের কি একটা হাড় বুঝি সরে গিয়েছিল, অমাবস্যা পূর্ণিমায় টন টন করে। শেষ পর্যন্ত হয়তো বাতেই দাঁড়াবে। সাধারণ বাত নয়, একেবারে খানদানী। বিছানায় বছরের মধ্যে ছ'মাস শুইয়ে রাখবে। সময় থাকতে ইলেকট্রিক ট্রিটমেণ্ট শুরু হ'ল। খরচ অনেক। কিন্তু তাই বলে তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। চুপচাপ একটা মানুষের কাতরানি শোনা যায় না।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা শেষ, কাজলের মাইনে তো গণ্ডুষ। শেষকালে নবতারার সোনা-দানায় হাত পড়ল।

আর এক অস্বস্তি কাজলের। শুধু ট্রামে বাসে চুটকি রসিকতাই নয়, ক্লাসের মেয়েরা পর্যন্ত আড়ালে টিটকারি আরম্ভ করল। দিদি-মণির রঙ আর চেহারা নিয়ে চাপা হাসি। কাজল প্রথম প্রথম গায়েই মাখত না কিন্তু ক্রমশই বাড়াবাড়ি। দু' একজন টিচারও আস্কারা দিতে লাগল।

একদিন সরমা তো সকলের সামনেই বলল কমনরুমে বসে, জানেন বেলাদি, মিস মুখার্জী ক্লাসে গেলে টুঁ শব্দটি হয় না। সেকেণ্ড ক্লাসের মেয়েরা পর্যন্ত চুপ। আর আমি কোন ক্লাশে ঢুকলেই যেন ভূতের নাচ শুরু হয়, কিছুতেই যদি কেউ কথা শোনে। সত্যি মিস মুখার্জীর মতন চেহারাটাও যদি হ'ত, তা হ'লে মেয়েরা ভয়েই চুপ করে থাকত।

কেউ কোন মন্তব্য করে নি। কিন্তু অমন করে কাজলের চোখ বাঁচিয়ে মুখ টিপে হাসার চেয়ে কিছু বলা ছিল হাজার গুণে ভাল।

অবস্থা আরও চরমে ওঠে।

সুলতা ঘোষ নতুন টিচার। বড়লোকের মেয়ে। চাকরিটা শখের। ছুটিতে গিরিডী কিংবা শিলং বেড়াতে যাওয়ার মতন এও একটা বিলাসিতা। তা ছাড়া সেক্রেটারীর সঙ্গে লতায় পাতায় কি একটা সম্পর্কও ছিল। সেই সুবাদেই চাকরি। তাহোক, কিন্তু কথা তো নয় যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। মানুষকে জ্বালিয়ে মারে।

কালি ভরতে গিয়ে উপচে পড়তে কাজল রুমাল দিয়ে কলমটা চেপে ধরেছিল। রুমালে কালির দাগ। এমন কিছু বেশী নয়, কিন্তু রুমাল বের করে মুখ মুছতে যেতেই পাশে বসা মিনতিদির চোখে পড়ে গেল।

ওকি কাজল, তোমার রুমালে কালি লাগল কি করে?

কাজল কিছু বলবার আগেই সুলতা কথা বলল, কালি হবে কেন মিনতিদি, নিশ্চয় মিস মুখার্জী মুখ মুছেছেন।

মাত্রা ছাড়ানো রসিকতা। সকলেই একটু বিচলিত হ'ল। একটি বার মুখ তুলেই কাজল মুখ নিচু করে ফেলল। ওর দুঃখ এরা কেউ বুঝবে না। সংসারের সমস্ত পাল্লাটা তো আর তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে নি। মাসান্তে ওদের উপার্জনের কয়েক মুঠো টাকার দিকে সারা সংসার ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে না। কাজলের বাইরের খোলসটার ওপরই সবাই ঘৃণার চোখ বোলাবে, কেউ চাইবে না অন্তরের দিকে। কুশ্রী দেহটারই খোঁজ নেবে, চাকায় পিষে যাওয়া মনটার নয়।

কাজলের বরাত ভাল। এম-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাকরির সন্ধান মিলে গেল। স্কুল কলেজে নয়, একেবারে সরকারী দপ্তরে।

নতুন দপ্তর। এ দেশের পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে পাথরে খোদাই শিলালিপি আর মাটিতে চাপা-পড়া দলিল দস্তাবেজ হাতড়ে কৃষ্টি আর ঐতিহ্যের সালতামামী। এ যুগের আলোয় বিগত যুগের

হিসাব করা। কাজল মুখোপাধ্যায়, ইতিহাসের নামকরা ছাত্রী। প্রফেসর বসাকই যোগাযোগ করে দিলেন। টেলিফোনে খোঁজ করে ডেকে পাঠালেন কাজলকে।

বাড়ি ফিরে সিঁড়িতে উঠতেই মার সঙ্গে দেখা। নবতারা আঁচলচাপা দিয়ে কি নিয়ে ওপরে উঠছিল, মেয়ের গলার আওয়াজে ফিরে দাঁড়াল।

একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেছি মা, সরকারী চাকরি। কাজল খুশীতে ডগমগ।

তাই বুঝি! নবতারাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, বাঃ, খুব ভাল হয়েছে। তোর বাবাকে একবার জানিয়ে আসি। মাইনেও বেশী পাবি তো?

আর এক ধাপ উঠতেই কাজলের নজর পড়ল মার আঁচলের দিকে।

কি নিয়ে যাচ্ছ মা?

নবতারা থতমত খেল। তাড়াতাড়ি ভাল করে আঁচল চাপা দিতে গিয়ে কেলেঙ্কারীর একশেষ। ঠোঙার পাশ দিয়ে সিঙাড়া দেখা গেল।

কাজল হেসে উঠতেই নবতারার চোখ ছলছল। ঠোঁট চেপে আস্তে বলল, আর বলিস নে কাজল, আমার হাড় মাস ভাজা ভাজা করে খেলে। কচি ছেলেরও বেহদ্দ। নিত্য নতুন ফরমাস, আমি কোথা থেকে যোগাই বল তো?

কথাটা কাজলও জানে। কতদিন লক্ষ্য করেছে, ছুটির দিন মা আর মেয়ে খেতে বসেছে, পিছনে ক্রাচের ঠুক ঠুক শব্দ। মুখ ফিরিয়েই অবাক হয়ে গিয়েছে। ক্রাচে ভর দিয়ে দরজার আড়াল থেকে বাবা উঁকি দিচ্ছেন। দু' চোখের লোলুপ দৃষ্টি ওদের ভাতের থালার ওপর।

শুধু এই নয়, মাঝে মাঝে পরাশরবাবু মুখ ফুটে বলেওছেন নবতারাকে।

সবই বুঝি, বুঝলে। একটা পা-ই না হয় গিয়েছে, তা বলে

দু' চোখের মাথা তো আর খাইনি। আমার বেলায় শুধু গলা ভাত আর একটা তরকারী, আর নিজেদের বেলায় থালা সাজানো ব্যাপার। বিকেলে এক কাপ চা, তাতে না দুধ, না চিনি। অথচ নিজের চোখে দেখলুম মণ্টু আর বাণীকে গরম গরম জিলিপি দেওয়া হচ্ছে চায়ের সঙ্গে। অবশ্য এই জগতের রীতি, পরাশরবাবু দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে গলার স্বরও করুণ করে তুলেছিলেন, যতদিন সংসারে টাকা ঢালতে পেরেছিলাম, আমার কদর ছিল। মানুষ যত্ন-আত্তি করত। আজ আমি তো মরা ঘোড়া। সংসারের গাড়ি তো টানতেই পারব না, মিছামিছি কেবল খানিকটা জায়গা জুড়ে আছি।

নবতারা চোখের জল সামলাতে পারেনি। মেয়ে মানুষ সব সহ্য করতে পারে কেবল নিজের খাওয়ার খোঁটা ছাড়া। তাছাড়া এমন অবুঝ মানুষ হয়! মণ্টু বাণীর সঙ্গে নিজের তুলনা করতে লজ্জাও হলনা একটু। মেয়ের রোজগারে সংসার চলছে সে খেয়ালও নেই।

বাপের ঘরে পা দিয়েই কাজল পিছিয়ে এল। একটা হাত মাথার নিচে রেখে পরাশরবাবু অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কাটা পা বালিশের ওপর সাবধানে রাখা। পাশের চেয়ারে ক্রাচ দুটো দাঁড় করান। কি অসহায় মুখ। গালে, কপালে অজস্র হিজিবিজি আঁচড়। প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, সামাজিক-জীবন সবই নিঃশেষিত। আঁকড়ে ধরার মতন কেউ নেই ধারে কাছে কোথাও। একমাত্র অবলম্বন এই কাঠের দুটো ক্রাচ। নিষ্ঠুর পৃথিবীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার একমাত্র অস্ত্র। আশা নেই, কেবল আশঙ্কা। সবাই অসীম উপেক্ষায় মানুষটার পাশ কাটিয়ে যাবে। আজকের সকলের অযত্ন আর অবহেলা বুঝি সেই ভয়াবহ পরিণতিরই দ্যোতক।

কথাটা কাজল সন্ধ্যার ঝোঁকে বলল। বাপের ঘুম ভাঙার পর।

ইজিচেয়ারে শুয়ে পরাশরবাবু চুপ করে সব শুনলেন। পুরোনো খবরের কাগজটা বুকের ওপর প্রসারিত করে। ক'দিন হল ব্যথাটা

আবার বেড়েছে। নড়তে চড়তে কষ্ট। ডাক্তার জানিয়েছেন, এই সময় একবার এক্স-রে করাতে পারলে ভাল হত। এত বয়সে হাড় ঠিকভাবে জোড়া লাগা সম্ভব নয়, তবে ঠিক জোড়া না লাগে, জোড়াতালির একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সময় থাকতে।

কাজলের কথা শেষ হওয়া মাত্র পরাশরবাবু উঠে বসলেন। কাজলের হাতের ওপর নিজের হাত রেখে বললেন, এইবার তো অনেক টাকা রোজগার করবি, আমার ভাল করে চিকিৎসা করা। ডাক্তার যে সব টনিক খেতে বলে গেছে, সেগুলো কিনে এনে দে। তোদের সংসারের জন্য আমিও তো মুখে রক্ত উঠিয়ে উদয়াস্ত খেটেছি। ভগবানের মার কাজল, নয়তো আমারই কি ইচ্ছে এমনভাবে শুয়ে থেকে তোর রোজগারে খাই।

পরাশরবাবু আর কথা বলতে পারলেন না। দুটো চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল। গালের মাংসপেশী কেঁপে উঠল থর থর করে। কপালে বাড়তি কয়েকটা খাঁজ।

শাড়ির আঁচল দিয়ে কাজল বাপের চোখ মুছিয়ে দিল। একটা হাত মাথার চুলের মধ্যে দিতে দিতে বলল, না বাবা, আর কষ্ট হবে না তোমার। কাল সকালেই ডাক্তার বোসকে আসতে বলব। তিনি যেমন বলবেন, সেইভাবেই চিকিৎসা হবে।

পরাশরবাবু কাজলের দিকে চোখ ফেরালেন। চোখের জলে সব অস্পষ্ট, তবু দেখতে ভুল হ'ল না। আরো যেন কালো হয়ে গেছে মেয়েটা, মুখ চোখ আরো কদর্য।

এক্স-রে প্লেট নেওয়া হ'ল, একটা নয়, পর পর তিনটে। চার রকমের মালিশ। সার্জিকাল বেল্ট। কেবল এক গাদা টাকার শ্রাদ্ধ। মানুষটার মন যেন আরো খিঁচড়ে গেল। ডাক্তার বোসকে ছেড়ে বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার মহলানবিশ। সেরা সার্জন ফারগুসন। দর্শনী চৌষট্টি মুদ্রা। কিন্তু সকলের মুখেই এক

কথা। পাকা হাড়ে আর কিছু করবার নেই। স্রেফ নেচারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। এ ছাড়া কোন পথ নেই।

কিন্তু পরাশরবাবুর মন খুঁতখুঁতানির অন্ত নেই। এত বড় শহর কলকাতা, ডাক্তার বদ্যিতে ঠাসবোঝাই। কত মারাত্মক অসুখ সেরে যাচ্ছে, নবজীবন পাচ্ছে কত মুমূর্ষু, কেবল পরাশরবাবুরই কোন উপকার হচ্ছে না! হবে আর কি করে। একটু গা লাগিয়ে চেষ্টা নয়, এক ডাক্তারে ফল হচ্ছে না তো অন্য ডাক্তার ডাকবার চাড় নেই। সার্জারি হার মানল তো কবিরাজী করতে দোষ কি। ছুরি কাঁচিতে না সারে তো আয়ুর্বেদই না হয় করা হোক। মনমোহন কবিরাজের আজকাল খুব নাম ডাক। তাঁকে পাওয়াই মুস্কিল। ভোর ভোর গিয়ে দাঁড়াতে পারলে তবে পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ নজর দেবে না এদিকে। কোন চেষ্টা চরিত্র নেই। অথচ বাড়ির অন্য ব্যবস্থা বেশ চালু। কারো সুখ সুবিধায় একটুও টান পড়েনি।

পরাশরবাবু শুয়ে কাটালে হবে কি, সব দিকে সজাগ দৃষ্টি।

সেদিন ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়েই পরাশরবাবুর নজরে পড়ল। পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে কাজল টেবিল মুছছে।

কাজল, পরাশরবাবু জোর গলায় ডাকলেন। ভীষণ খিট্‌খিটে হয়েছে মানুষটা। একবারের বেশী কাউকে দুবার ডাকতে হলেই রাগে একেবারে ফেটে পড়েন। দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। কোন লোক ওঁকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, এমন একটা সন্দেহ। সব সময়।

ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই কাজল ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু এদিকে আয়। বেশ মোলায়েম গলার স্বর। কাজল আড়চোখে একবার ঘড়ির দিকে চাইল। সবে পাঁচটা। ওষুধ খাওয়ানো তো সাড়ে ছটায়। এর মধ্যে ডাকাডাকি যে!

বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পরাশরবাবু এক হাতে কাজলের শাড়ির একটা কোণ চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

এটা নতুন কিনলি বুঝি ?

একটু সঙ্কুচিত হ'ল কাজল। পরাশরবাবু যে আচমকা এমন একটা প্রশ্ন করবেন ভাবতেও পারেনি।

পোষাকের দিকে কাজলের সাত জন্ম ঝোঁক নেই। ছেলেবেলা থেকেই। যে কোন একটা আবরণ হলেই হ'ল। নিজের চেহারা কুৎসিত বলে নয়, বই ছাড়া অন্য কোন দিকে তার কোনদিনই খেয়াল নেই। অল্পদামী আটপৌরে শাড়ি পরেই সে এতকাল কাটিয়েছে। এ শাড়িটা সে আগের দিন বিকেলে কিনেছে। সিল্কের ছাপা শাড়ি।

খুব আস্তে কাজল উত্তর দিল, হ্যাঁ।

হাত নিয়ে শাড়িটা পরাশরবাবু পরীক্ষা করলেন। পাড়ের ওপরও হাত বোলালেন দু'চার বার, তারপর বললেন, খুব দামী শাড়ি। কত পড়ল ?

প্রায় ভাঙা গলায় কাজল বলল, বাইশ।

বাইশ ? আশ্চর্য, অথচ মালিশের শিশিটা আজ দুদিন হল খালি পড়ে আছে। ইনফ্রা-রেড রে নেবার কথা ডাক্তার বলেছিলেন, তাও বন্ধ।

যেন আগুনে হাত লেগেছে এইভাবে পরাশরবাবু শাড়িটা ছেড়ে দিলেন হাত থেকে। নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলেন।

কাজল সরে এল। খুব আস্তে পা ফেলে। মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে। চৌকাঠ পার হয়ে সিঁড়ির পাশে নিজের ছোট ঘরে এসে ঢুকল। দু' গালে হা'ত রেখে বিছানার ওপর বসল।

প্রাণপাত করে কাজল খাটছে। উপার্জনের পাই পয়সাটি পর্যন্ত সংসারে ঢালছে। বাপের চিকিৎসা, ছোট ভাই-বোনের স্কুলের খরচ, মার যাতে কষ্ট একটু কম হয় সেজন্য একটা ঝিও রেখেছে। নিজেকে মুছে ফেলেছে নিশ্চিহ্ন করে। সুখ-সুবিধা, আমোদ-প্রমোদ, এ বয়সের ছোটখাট দু' একটা শখ সব ছেড়েছে।

বাপের মালিশ যে ফুরিয়েছে, সে কথা কাজল জানে না। কেউ

ওকে বলেনি। বললে অফিস ফেরত নেমে ঠিক কিনে নিয়ে আসত। আর ইনফ্রারেড রে। ডাক্তার নিজেই একটু অপেক্ষা করতে বলেছেন, অন্ততঃ দিন পনের।

হু' চোখ জলে ভরে আসতেই বিছানা ছেড়ে কাজল উঠে দাঁড়াল। শাড়িটা পরার আগে অনেকক্ষণ ভেবেছে। অফিস থেকে ফিরে এসে পিজবোর্ডের বাক্সটা খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে শাড়িটা! চমৎকার শাড়ি। যেমন জমি, তেমনি ছাপার কাজ। ছুটির দিন, গা ধুয়ে এসে কতকটা আনমনাভাবেই শাড়িটা অঙ্গে জড়িয়েছে।

এমন কাজ করেছে শুধু শাড়িটা পছন্দসই বলে নয়, এ শাড়ি কেনার একটা ইতিহাসও আছে। খুব সামান্য ব্যাপার, কিন্তু একেবারে উপেক্ষার নয়।

দিলীপ ব্যানার্জী। ব্যাক-ব্রাস করা চুলের রাশ। মোটা ফ্রেমের চশমা। ভারিক্কি চেহারা। ইতিহাসের কৃতী-ছাত্র। কাজলের বছর চারেকের সিনিঅর। বাইরে কোথায় প্রফেসরী করছিল, বসাকই খোঁজখবর করে ওকে এখানে এনেছেন। এখন প্রায় বসাকের ডান হাত। সব ব্যাপারেই শলাপরামর্শ ওর সঙ্গে।

দিলীপ বসে কাজলের ঠিক উল্টোদিকে। একেবারে মুখোমুখি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে খুব কম কথাবার্তা চলে।

কোনারকের ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে দিলীপ হঠাৎ থেমে গেল। কাজলের ওপর চোখ বুলিয়ে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর বলল, শুকনো অতীতের কঙ্কাল নিয়ে দিনরাত নাড়াচাড়া করছি, এতে না আছে রঙ, না আছে রস, তার ওপর আপনিও যদি দিনের পর দিন অমন খটখটে সাদা শাড়ি পরে আসেন, তা হলে আমার আর পাগল হতে দেরী হবে না।

কথাটা এত আকস্মিক যে বুঝতে কাজলের বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগল, কিন্তু বুঝতে যখন পারল তখন অনেকক্ষণ লজ্জায় মুখ তুলতে পারল না।

একই ঘরে দুজনে বসে। আশে পাশে অজস্র ম্যাপ আর মূর্তির ছবি। আলমারি-বোঝাই পুরাতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্বের কেতাব। পাথর, কাগজ আর মাটি। জরাজীর্ণ অতীত। দিলীপ সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু সত্যি কি ওইটুকুই কেবল বলতে চেয়েছে! সব অতীত, বর্তমান বুঝি কেবল ওরা দুজন। রাশিকৃত ফসিলের মাঝখানে দুটি সজীব সত্তা। তাই রঙে রসে সঞ্জীবিত হতে হবে কাজলকে। কিন্তু শুধু শাড়ির রঙ বদলালেই কি মনে রঙ ধরবে! ঝলমলে আবরণ আর আভরণেই প্রাণে যৌবনের জোয়ার আসবে।

তবু কথাগুলো কাজলের খুব ভাল লাগল। ওর ছাব্বিশ বছরের জীবনে এমন কথা কেউ ওকে বলেনি। কোনদিন নয়।

অনেক পরে কাজল আস্তে আস্তে বলল, আপনার হাতের কাজ বুঝি শেষ হয়ে গেছে, তাই সব আবোলতাবোল কথা শুরু করেছেন?

দিলীপ হাত দিয়ে চশমাটা ঠিক করে নিল। কাগজের গোছার ওপর পাথর চাপা দিয়ে হাসল, বিশ্বাস করুন, হাতের কাজ এখনও শুরুই করিনি। শুধু ভাবছিলাম কে কবে কোন্ খেয়ালে কতকগুলো হিজিবিজি নক্সা তৈরি করে গেছে, আমরা কেন মাথা খুঁড়ে মরছি সে শিল্পসৃষ্টির জন্মকাল আর জাতির নিরিখ নিয়ে। গথের প্রভাবপুষ্ট না গ্রীক ভাস্কর্যের অনুকরণ তা নিয়ে কিসের এত মাথাব্যথা।

এবার কাজল পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চাইল। রাশভারী লোক, কম কথার মানুষ, মাথা হেঁট করে চিরকাল নিজের কাজ করে যায়, কিন্তু আজ এ কি ব্যাপার! ক্লান্তি আসছে তারই ইঙ্গিত, না বসন্তের হাওয়া লেগেছে বিশীর্ণ প্রশাখায়! নতুন পল্লবের আভাস, নতুন মঞ্জরীর সমারোহ!

হঠাৎ হল কি আপনার? অমৃতে অরুচি?

দিলীপ কোন উত্তর দিল না। হাত দিয়ে জানলার দিকে দেখিয়ে দিল।

কাজল পিছন ফিরে চেয়েই অবাক। কৃষ্ণচূড়ার একটা ডাল

জানলার কাছ বরাবর। মরা শুক্‌নো ডাল। এর আগে অনেকবার কাজলের চোখে পড়েছে। না পড়ে উপায় নেই। হাত দিয়ে ডালটা সরিয়ে তবে জানলার পাল্লাটা বন্ধ করতে হয়। কিন্তু আজ একি কাণ্ড! শুধু অজস্র সবুজ পাতার গুচ্ছই নয়, রক্তের মত রাঙা ফুলের স্তবকে সমস্ত ডাল ঢেকে গেছে। কাচের শার্শীতেও লালচে ছায়া।

কাজল কোন কথা বলল না। নির্নিমেষ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল। চোখ ঘুরিয়ে দিলীপের দিকে আর চাইতে পারল না। মাথা নিচু করে ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

বিকেলে কাজল অফিস-ফেরত সোজা বাড়ি গেল না। মাঝপথে মার্কেটে নামল। বাপের জন্য কিছু ফল কেনার ছিল। ফল কেনা শেষ হলেও মার্কেটের আনাচে কানাচে ঘুরল। পায়চারি করল সাজানো শো-কেসের সামনে, তারপর হঠাৎ এক কাপড়ের দোকানে গিয়ে ঢুকল। বাছাবাছি নয়, রঙ পছন্দ নয়, চোখের সামনে যেটা দেখল, সেটাই তুলে নিল। রঙিন শাড়ি হলেই হল। আর কিছু দেখবার দরকার নেই। দিলীপ তো রঙই খুঁজেছিল।

এমন শাড়ি পরে বাইরে বেরোতে কাজলের লজ্জা লজ্জা করল। অনেক ভেবে-চিন্তে তাই বাড়িতেই পরল, কিন্তু পরবার সময় স্বপ্নেও ভাবেনি, এ নিয়ে এত কাণ্ড হবে।

হাত বাড়িয়ে কাজল আলনা থেকে একটা আধময়লা শাড়ি টেনে নিল। কালো পাড় সাদা জমি। সিল্কের শাড়িটা ছেড়ে ফেলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে পঙ্গু অসহায় বাপের দীর্ঘশ্বাস জড়ান। শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে কাজল চৌকাঠের এ-পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকল, বাণী, বাণী!

সাড়া নেই। বোধ হয় বাড়িতে নেই। বাড়িতে থাকলে ছুটে আসত। ঠিক জানে দিদি কখনও বৃথা ডাকে না। হয় রঙচঙে ছবির বই, কিংবা খেলনা, নিদেনপক্ষে কাচের চুড়ি, কিছু একটা হাতে থাকেই।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কাজল আবার ঘরের মধ্যে ঢুকল। শাড়িটা পিজবোর্ডের বাক্সের মধ্যে ভরে ফেলল। পরের দিন সকালে বাণীকে ডেকে শাড়িটা দিয়ে দিলেই হবে।

বাণীর পিছন পিছন নবতারা এসে ঘরে ঢুকল।

হ্যাঁরে নতুন শাড়িটা তুই দিয়েছিস বাণীকে ?

কাজল অফিস থেকে ফিরে বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিল, মাকে দেখে উঠে বসল। হেসে বলল, হ্যাঁ মা, ও শাড়িটা ওকেই মানাবে।

তুই তো নিজের জন্য কিনেছিলি। একদিন পরেই হয়ে গেল ?

নবতারার সন্দেহ গেল না।

দোকানদারের ভাঁওতায় ভুলে কিনেছিলাম মা। বলেছিল ও রঙটা নাকি আমায় ভারি মানাবে, কাল বিকেলে পরেই ভুল ভাঙল।

হালকা সুরে আরম্ভ করলেও শেষদিকে গাঢ় হয়ে এল কাজলের কণ্ঠ। বিষাদের ছিটে, দুঃখের মিশেল। কাজল মুখটা অন্যদিকে ফেরাল, বুঝি চোখের জল লুকোতেই।

নবতারা কিন্তু অতশত বুঝল না। কাজলের দিকে না ফিরে চোখ ফেরাল নিজের হাতের নতুন শাড়ির ওপর।

তা বলে এত ভাল শাড়ি তোমায় এখন দিচ্ছি কিনা। এটা তোলা থাক। মেয়ে যেভাবে বেড়ে চলেছে, বেশীদিন ওকে ঘরে রাখাই চলবে না।

নবতারা বাইরে গেল। বাণী কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কাজলের গা ঘেঁসে।

কিরে কিছু বলবি ? কাজল জিজ্ঞাসা করল।

বাণী আরও সরে দাঁড়াল কাজলের দিকে। আস্তে আস্তে বলল, ওই শাড়িটা পরলে তো তোমায় ভালই দেখায় দিদি। তুমি পরবে না শাড়িটা ?

কাজল হাসল। বোনের গাল টিপে দিয়ে পরিহাস-তরল গলায় বলল, তোকে পরলে আরো সুন্দর দেখাবে!

বাণী আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

কাজল মুখ তুলতেই সামনে টাঙান আয়নার সঙ্গে মুখোমুখি আয়নার ওপর কাজল সব সময়ে একটা ঢাকা দিয়ে রাখে। এলোমেলো হাওয়ায় ঢাকা কখন সরে গেছে।

বিশ ক্যাণ্ডেল বাতি। আলো যা ছড়ায় তার চেয়ে অন্ধকার বাড়ায় আরো বেশী। স্বল্প আলোয় বীভৎস দেখাল কাজলের মুখ। সারাদিনের শ্রান্তি আর পরিশ্রমে আরো বিষণ্ন। কালি পড়েছে চোখের কোলে, অগোছাল চুলের রাশ। সারা মুখে কোথাও সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটা নেই। এই চেহারায় অমন একটা শাড়ি জড়াতে কেন যে ছাই সাধ গিয়েছিল, ভাবতেও কাজলের আশ্চর্য লাগল। ভাগ্যিস বাপের চোখে পড়েছিল নতুন শাড়িটা, নয়তো কাজল ওটা পরেই পরের দিন অফিসে চলে যেত। মুখে কিছু বলত না কিন্তু দিলীপ মনে মনে হাসত। ফসিলের মাঝখানে ও যে সজীব সেটা বোঝাবার জন্য বুঝি কাজল এইভাবে সেজে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক জীবের সগোত্র।

বাতিটা নিভিয়ে কাজল চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরের দিন কাজল একটু সকাল সকাল অফিসে গেল। প্রফেসর বসাক কদিন আসবেন না। রাজপুতানায় গেছেন। ভুট্টার ক্ষেত থেকে এক ত্রিভুজা মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। অর্ধ-নারীশ্বরের সামিল। কাদা মাটি ধুয়ে পরিষ্কার করে সেটিকে নিয়ে আসতে হবে। মূর্তির গড়ন আর অলঙ্কারের প্যাটার্ন দেখে জন্মকাল ঠিক করতে হবে। কুলুজির হদিস। মহেন-জো-দড়োর আগে না পরে তাই নিয়ে ঘোরালো থিসিস। এমন সুযোগ ছাড়বার পাত্র প্রফেসর বসাক নন।

কাজল নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। পাল বংশের সময়ের

মন্দিরের কারুকার্যের পদ্ধতি নিয়ে কাজল প্রায় মাস দুয়েক ধরে নাজেহাল হচ্ছিল। নীল কাগজে স্তূপাকার নক্সা, রকমারি সাইজের ফটো। মোটা মোটা সব বই। কাগজ গুছিয়ে কাজল লেখা শুরু করল। দিলীপ আসেনি। সামনের চেয়ার খালি।

মিনিট কুড়ি। আচমকা জুতোর মস মস শব্দ। কাজল চোখ তুলেই অবাক।

দিলীপ ঘরে ঢুকল। দুহাতে ফাইলের বদলে রজনীগন্ধা আর চন্দ্রমল্লিকার গোছা।

কাজল মুচকি হাসল, কি ব্যাপার আপনার?

আর বলবেন না। দিলীপ ফুলের গোছা কাজলের টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলল, এক বন্ধু বিলেত যাচ্ছেন, আমার তাকে সি-অফ করার কথা। ফুলের গোছা নিয়ে বেলা সাড়ে দশটায় স্টেশনে গিয়ে শুনি বম্বের গাড়ি সাতটা বিশে ছেড়ে গেছে। অগত্যা বম্বের ঠিকানায় বন্ধুকে এক তার করে ফিরে এলাম।

সে কি? কাজল হাসিতে ফেটে পড়ল, ট্রেনের এত গোলমাল হল কি করে?

ট্রেনের গোলমাল ততটা হয়নি, দিলীপ মাথা চুলকাল, হয়েছে টাইম-টেবিলের গোলমাল। মানে আড়াই বছরের পুরনো টাইম-টেবিলের ওপর নির্ভর করলে যা হয় আর কি!

আড়াই বছরের পুরনো? কাজল অবাক-চোখে চেয়ে রইল।

হ্যাঁ তা হবে। আলমারির মাথায় পড়েছিল, সকালবেলা সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি।

কাজল ফুলের গোছার ওপর হুমড়ি খেয়ে হাসতে শুরু করল।

কাজেই ফুলগুলো আর কেন নষ্ট হবে। ওগুলো ফেরৎ নিয়ে এলাম। ওগুলো আপনিই নিন।

বটে! কপট রাগে কাজল চোখ দুটো বিস্ফারিত করল, বন্ধুর জন্য কেনা ফুল—

বান্ধবীরই প্রাপ্য। দিলীপ নির্বিকার গলায় যোগান দিল।

অনেকক্ষণ কাজল মুখ তুলতে পারল না। কিন্তু মুখ না তুললেই বুঝি নিস্তার আছে। নথিপত্র ঘাঁটার ফাঁকে ফাঁকে ফুলের উগ্র সুরভি, শুধু কাজই নয়, পরিবেশও ভোলায়। বার বার চোখ পড়ে যায় নিষ্কলঙ্ক রজনীগন্ধার ওপর।

বিকালে কাজল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপও উঠল।

চলুন আমাকেও আপনাদের ওদিকে একবার যেতে হবে।

আসল কথাটা কিন্তু দিলীপ বলল রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে।

সত্যি, সেদিন আমারই ভুল হয়েছিল।

ভুল ? থমকে দাঁড়িয়ে কাজল ভ্রূ তুলল।

সাদা রঙেই আপনাকে মানায়। বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও, সাদা যে সব রঙের সমন্বয় এটুকু আমার জানা উচিত ছিল।

কাজলের বুকের মধ্যে অসহ্য দাপাদাপি। মুখচোখ ফেটে বুঝি অজস্র ধারায় রক্ত ছিটকে পড়বে। টনটন করছে কপালের দুটো পাশ।

কোথাও একটু বসলে হত। কাজল ক্লান্ত গলায় বলল।

সামনে পার্কের ছায়াঘন নির্জনতা। কিন্তু সেদিকে কেউ গেল না। দুজনে ঢুকল চৌরঙ্গীর কোলাহল-মুখর রেঁস্তরায়। সকলের মিলিত কলরবে সেখানে নিজেদের কথা চাপা পড়ে যাবে। হৃদস্পন্দনের শব্দও বেইমানি করবে না।

পার্টিশন-ঘেরা কামরায় দুজনে মুখোমুখি বসল।

কি খাবেন বলুন ? দিলীপ ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল।

আঁচল দিয়ে কাজল কপালের ঘাম মুছে নিল। খুব আস্তে বলল, জল।

দিলীপ সশব্দে হেসে উঠল, সর্বনাশ ! বয়দের ডেকে শুধু জল অর্ডার দিলে বের করে দেবে এখান থেকে, কিম্বা হয়তো রাস্তার টেপাকল দেখিয়ে দেবে। তারপর একটু থেমে আবার বলল, দু'কাপ কফি তো বলি আগে, তারপর ভেবে চিন্তে অর্ডার দেওয়া যাবে।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কথা আরম্ভ হল।

জানেন, দিলীপ শুরু করল, বাড়ি ফিরতে আমার ইচ্ছাই করে না। অফিসে তবু কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে সব ভুলে থাকি, অন্তত ভুলে থাকবার চেষ্টা করি। এমন নিঃসঙ্গ জীবন।

দিলীপের সম্বন্ধে কাজল কিছু কিছু শুনেছে। প্রফেসর বসাকের কাছে। দিলীপ বিপত্নীক। বিবাহিত জীবনের পরমায়ু বছর খানেক। দক্ষিণ কলকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে। একেবারে একেলা। জীবনের সঙ্গিনী ছেড়ে যাবার পর থেকেই সঙ্গী একগাদা বই আর জার্নাল। যা মাইনে পায়, তার বেশীর ভাগই যায় বই আর ম্যাগাজিন কিনতে।

বিশেষ কিছু না ভেবে কাজল বলেই ফেলল কথাটা।

ঘরনী আনুন আবার, তা হলেই ঘর ভাল লাগবে।

কথাটা কানে যেতেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল দিলীপের মুখ। হাত কেঁপে কফি জামার ওপর গিয়ে পড়ল।

মাপ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে কাজল বলল, আমি ভেবে বলিনি কথাটা। আই অ্যাপোলজাইস।

না না, দিলীপ ঘাড় নাড়ল। মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে বলল, মনে করার কি আছে। সকলে যে কথা বলত তাই আপনি বলেছেন। সত্যি কথাই তো বলেছেন।

সত্যি কথা! কাজল বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দিলীপের দিকে চাইল। তা হলে বুঝি কোথাও আবার বিয়ের ঠিক করেছে। সেই কথাটা জানাবার জন্যই কাজলকে এখানে এনেছে।

কাজল একটু অপেক্ষা করল। তাই যদি উদ্দেশ্য হয় তো দিলীপ নিজেই বলবে। মেয়ের নাম, ধাম, রূপগুণের বর্ণনা। এমনও হতে পারে কাজলকেই পাঠাবে খোঁজ-খবর নিতে। এসব বিষয়ে মেয়েদের চোখ আরও তীক্ষ্ণ। খুঁটিয়ে সব কিছু দেখে।

দিলীপ কিন্তু চুপচাপ। একমনে টেবিলে আঁচড় কাটছে।

বেশ কিছুটা সময় কাটল। আশপাশের কেবিন থেকে কাঁটা

চামচের শব্দ। হাসির আওয়াজ। চঞ্চল সমুদ্রের মাঝখানে দুটি দ্বীপের মতন ওরা শান্ত, অবিচল।

আপনি কোথায় যাবেন বলছিলেন না? কাজলই কথা বলল।

দিলীপ চমকে উঠল। নিজের মনিবন্ধে বাঁধা ঘড়ির ওপর নজর দিয়ে গলায় হতাশার সুর মিশিয়ে বলল, আর গিয়ে লাভ নেই। ভদ্রলোক এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছেন বাড়ি থেকে। খুব দরকারী কাজ নয়, আর একদিন যাওয়া যাবে।

গোলমাল বাঁধল পয়সা দেবার সময়। কাজল অনেক আগেই হাতব্যাগ থেকে পয়সা বের করে রেখেছিল, দিলীপ বয়কে ডাকতেই হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বাঃ, ওকি করছেন আপনি? দিলীপ এক হাতে কাজলের হাতটা চেপে ধরল, আর এক হাত দিয়ে পকেট থেকে নোট বের করল।

বাইরে বয়ের পায়ের শব্দ হতেই কাজল ফিসফিসিয়ে বলল, পয়সা না হয় আপনিই দেবেন, কিন্তু হাতটা ছাড়ুন তো, বয় দেখলে কি মনে করবে।

তাড়াতাড়ি কাজলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে দিলীপ বলল, মাপ করবেন, ভারি অন্যায় হয়েছে আমার।

কাজল হাসল। কিছু বলবার আগেই পর্দা ঠেলে বয় এসে ঢুকল।

বিল মিটিয়ে দিলীপ বাইরে চলে এল। কাজল পিছন পিছন।

একটু এগিয়েই দিলীপ বলল, চলি, আবার কাল দেখা হবে।

ট্রামের খালি সীটে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে কাজল প্রথম টের পেল কত জোরে দিলীপ হাতটা চেপে ধরেছিল। দাগ শুধু হাতের কব্জিতেই নয়, মনেও চেপে বসেছে। কব্জির দাগ হয়তো মিলিয়ে যাবে দু' একদিন পরে, কিন্তু মনের দাগ মেলাতে কতদিন নেবে কে জানে।

হয়তো এক জন্ম। হয়তো অনন্ত কাল।

প্রথমে বাণীর কানে গেল। বাথরুমের দরজায় কান পেতে সে কিছুক্ষণ শুনল তারপর ছুটে নবতারার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, মা, গা ধুতে ধুতে দিদি গান গাইছে।

নবতারা প্রথমে চুপ করে রইল তারপর হেসে বলল, তাতে হয়েছে কি? সারা দিনরাত চেঁচিয়ে তুই বাড়ি মাথায় করতে পারিস আর দিদি একটু গাইলেই দোষ!

না, দোষ গুণের কথা নয়। বাণী মুখটা কাঁচু মাচু করল। কত দিন দিদিকে সাধ্য সাধনা করেছে বাণী সিনেমায় যাবার জন্য। বাড়ির দোরে সিনেমা। একটু হাঁটতে হবে না। কিন্তু কাজল রাজী হয় নি। অন্য সকলকে পয়সা দিয়েছে কিংবা মাঝে মাঝে অফিস ফেরত আর সবাইয়ের জন্য টিকেটও কিনে এনেছে কিন্তু নিজে যায় নি। বলেছে, তোমরা যাও, আমার ওসব ভাল লাগে না।

শুধু কি সিনেমা! আশেপাশে কোথাও নিমন্ত্রণ হলে প্রথম প্রথম এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। শরীর খারাপ কিংবা অফিস থেকে বয়ে আনা এক গাদা কাজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাশ কাটাবার প্রয়াস। অনেক বলাবলির পর কোথাও গেলেও বাড়তি সাজগোজ নয়, শুধু আটপৌরে শাড়ি পোশাকে গিয়েছে, তাও একটু এদিক ওদিক কথা নয়, বান্ধবীদের সঙ্গে হাসি মস্করা নয়, চুপচাপ একপাশে বসে খেয়েই উঠে এসেছে। সেই দিদির মুখে সিনেমার গান!

আবার বাণী বাথরুমের কাছে এসে দাঁড়াল।

কল খোলা। খুব দ্রুত ধারায় জল পড়ছে। জলের শব্দ আর চুড়ির ঝুন ঝুন আওয়াজে গানের কলির অনেকখানিই শোনা গেল না, কিন্তু যেটুকু শোনা গেল বাণীর বিস্ময়ের পক্ষে সে টুকুই যথেষ্ট। বাণীর বিস্ময়ের বোধ হয় আরো কিছু বাকি ছিল। বাথরুম থেকে বেরোবার পরও কাজলের গান থামল না। চাপা সুর ঠোঁটের গুনগুনানিতে রূপান্তরিত হল।

বাণী পা টিপে টিপে কাজলের ঘরে উঁকি দিল। হাতের কব্জিটা চেপে ধরে কাজল চেয়ারে বসে রয়েছে।

হাতে কি হয়েছে দিদি? খুব আস্তে আস্তে বাণী জিজ্ঞাসা করল। একটু গলা বাড়িয়ে।

আচমকা গলার আওয়াজে কাজল চোখ তুলল। হাতের কব্জি ছেড়ে দিয়ে ইসারায় বাণীকে কাছে ডাকল।

কি হবে হাতে?

ওই যে হাত চেপে বসে রয়েছ?

কাজল মৃদু হাসল। হাতের কব্জিটা তুলে ধরে বলল, ও কিছু নয়, ট্রামের ভিড়ে নামবার সময় একটু চাপ লেগেছে। দু একদিনেই সেরে যাবে।

কথাগুলো শেষ করেই কাজল গলাটা একটু গম্ভীর করল, তার-পর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে বল? ভূগোল পড়ছিস ভাল করে? ওটাতে তো তুই একেবারে কাঁচা।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই বুঝি চিরকাল সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। কি কুক্ষণেই বাণী দিদির ঘরে উঁকি দিতে গিয়েছিল।

নে, বই নিয়ে আয়, দেখি পড়াশোনা কেমন হচ্ছে।

বাণী বেরিয়ে গেল। আচ্ছা মুস্কিল। এর চেয়ে দিদিকে একলা বসে গাইতে দিলেই হত। বাঁচবার আর কোন পথ নেই, বইয়ের গোছা নিয়ে দিদির সামনে বসতেই হবে।

পরের দিন কাজল অফিসে পৌঁছে দেখল দিলীপ আগেই এসে গেছে। শুধু আসাই নয় ফাইল খুলে কাজে বসেছে।

কাজল হাসল। বলল, নমস্কার, আজ এসেই একেবারে কাজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন যে?

দিলীপ মুখ তুলল না। চাপা গলায় বলল, কাল দেরী করে আসার ক্ষতিপূরণ।

আর কোন কথা নয়। কাজল মোটা একটা বই নকল করতে শুরু করল। প্রফেসর বসাকের নির্দেশ। আইওনিআন ভাস্কর্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তার ওপর নির্ভর করে বসাক থিসিসের ইমারত গড়ে তুলবেন।

দিলীপই কথা বলল, অনেকক্ষণ পর, আমার একটু উপকার করতে পারবেন?

ব্যাপারটা কাজল আঁচ করল। কাল বিকেলে দিলীপ লজ্জায় বলতে পারেনি, আজ সাহস সংগ্রহ করেছে। নিজের বাছাই করা মেয়েকে অন্য লোক দিয়ে যাচাই করতে চায়। তাই কাজলকে দরকার।

উপকারের ধরণটা শুনি আগে। কাজল হাসল।

মারাত্মক কিছু নয়। পাড়ায় একটা বিয়ে। উপহার দেওয়া দরকার, হাল-ফ্যাসানের কোন জিনিস।

এবার কাজল দিলীপের দিকে দেখল না। চোখ নিচু করে মৃদু গলায় বলল, বেশ তো, তার জন্য আর আমাকে কি দরকার। আপনিই তো কিছু একটা কিনে দিতে পারেন?

আমি! বিস্ময়ে দিলীপ দুটো চোখ বিস্ফারিত করল, তবেই হয়েছে। Vogel এর Iconographic Notes কিংবা এক ভল্যুম 'মগধের শিল্পকলা' কিনে বসব। আমার দৌড় ওই পর্যন্ত। বিকেলে আপনার সময় হবে কিনা বলুন?

সময়! অফুরন্ত সময় হাতে রয়েছে। বাড়ি ফিরে কিই-বা কাজ কাজলের। ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবে কিংবা বাপের দুঃখের কাহিনী শুনতে হবে। সারাটা দুপুর পরাশরবাবু শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়েন। কেবল দেশ বিদেশের খবরই নয়, ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ বোলান। নতুন কোন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল কিনা, নতুন কোন ফার্মেসীর নবতম কোন পেটেণ্ট ওষুধ। এমন কিছু চোখে পড়লেই লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রাখেন। মেয়ে ফিরলেই কাগজটা তার সামনে ফেলে দেন।

দেখ তো কি একটা ওষুধ বেরিয়েছে, আমার রোগের লক্ষণের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। অফিস ফেরত একবার দেখবি খোঁজ করে? অবশ্য তোর পক্ষে একটু ঘুরপথই হবে, তবে যদি উপকার হয় ওষুধটায়, তবে তোর ঘোরাটা অনর্থক হবে না।

মাঝে মাঝে কাজল খোঁজখবর করে এনেও দিয়েছে ওষুধ। কিন্তু ওই কয়েক দিন। শিশিটা একদিন নিচের তাকে সরিয়ে রেখে পরাশরবাবু চেঁচামেচি করেছেন, দূর, দূর, সব বাজে, কেবল চটকদার বিজ্ঞাপন। কোন কাজ হয় না, শুধু মানুষের পয়সাগুলো অযথা নষ্ট।

এই তো কাজের ধারা। তাই কাজল উত্তর দিল, না কাজ আর কি বাড়িতে। কিন্তু আমি ভাবছি আমার পছন্দ করা জিনিস আপনার পছন্দ হলে হয়।

আমার পছন্দ, হায় ভগবান! দিলীপ সশব্দে নিজের কপাল চাপড়াল, যদি বলেন তো আমি না হয় দোকানের বাইরেই বসে থাকব। আপনি কিনে আনবেন, আমি মোড়ক শুদ্ধ যেখানে দেবার দিয়ে আসব। প্যাকিংও খুলব না।

কাজল হাসল। এ নিয়ে আর কথা হল না। কিন্তু পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ কাজলের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

নিন, নথিপত্র গোটান।

অফিস থেকে দুজনে তাড়াতাড়ি বেরোল বটে কিন্তু রাস্তায় নেমে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। ট্রামবাস ঠাস বোঝাই। ঘরমুখো কেরানীর চাপে কানায় কানায় পূর্ণ। পা ঠেকানই দুষ্কর।

দিলীপ ইতস্তত করল, একটা ট্যাক্সি নিলে হত।

কাজল মাথা নাড়ল, কি দরকার। আর একটু পরেই ভিড় কমে যাবে। তাছাড়া আপনার নিমন্ত্রণ তো রাত্রে। ন'টার আগে নিশ্চয় যাবেন না।

তা যাব না, কিন্তু আপনি কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন।

অপেক্ষা করাই তো মেয়েদের ধর্ম। হঠাৎ কাজলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অবশ্য ভাগ্য ভাল কাজলের। গর্জনরত বাসের শব্দে তার গলার স্বর চাপা পড়ে গেল। দিলীপের কানে গেল না।

পায়ে পায়ে হেঁটে দুজনে একটা বইয়ের স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। স্তূপাকার জার্নাল। হরেক রকমের। রাজনীতি থেকে হৃদয়নীতি, ছায়াছবি থেকে জ্যোতিষতত্ত্ব, কোন বিষয় বাদ নেই। কিছুক্ষণ পাতা ওল্টাল। ওরই মধ্যে দিলীপ বেছে একটা বই কিনল। সমাজতত্ত্বের হালকা বই।

দুজনে বই ওল্টাল বটে কিন্তু দুজনেরই চোখ রইল ট্রামবাসের দিকে। একটু ভিড় কমলেই যাতে উঠতে পারে।

একটা কাজ করলে হয়। কাজলের যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এইভাবে কথাটা বলল।

কি ? দিলীপ ঘুরে দাঁড়াল।

চলুন দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া যাবে। দোকানপসার দেখতে দেখতে। পছন্দসই যদি কিছু চোখে পড়ে কিনে নিলেই হবে। ভিড়ের ধাক্কার চেয়ে সেই তো অনেক ভাল।

কিন্তু এতটা পথ হাঁটতে হাঁটতে যাবেন ?

দেহটা যে ননীর নয়, সে তো রঙেই মালুম পাচ্ছেন। চলুন।

এরপর আর কথা চলে না। দুজনেই চলতে শুরু করল। ভিড় বাঁচিয়ে। গল্প করতে করতে সত্যিই পথ খুব বেশী মনে হল না। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে 'কমলালয়'-এর গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

দিলীপ ফুটপাথের ধারে এসে বলল, মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। আপনি ভিতরে গিয়ে সওদা শেষ করুন। কথার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ টাকার ব্যাগ খুলল।

তা কি হয় ? উপহার দেবেন আপনি আর আপনি সঙ্গে

থাকবেন না। ঝাল খাওয়াটাই খারাপ কিন্তু আরো খারাপ পরের মুখে খাওয়া।

মনে মনে কাজল ভেবে রেখেছিল শাড়িই কিনবে কিংবা মাঝারি দামের আইসক্রীম সেট, কিন্তু ঘোরাফেরা করতে করতে সে থেমে গেল। চেয়ে দেখল দিলীপও থমকে দঁাড়িয়ে পড়েছে সেই দিকে চেয়ে। একেবারে কোণের দিকে একটা নটরাজ মূর্তি। ব্রোঞ্জের। গঠন-নৈপুণ্যে আর কারুকার্যে অপরূপ। সচরাচর পথে ঘাটে যে ধরণের প্রাণহীন মূর্তি দেখা যায়, সে রকম মোটেই নয়।

বেশ জিনিসটা, না? কাজল বলল।

এখানকার নয়, বোধহয় বাংলার বাইরে থেকে আমদানী করেছে।

সত্যিই তাই। কাছে দঁাড়ান ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করতেই জানা গেল মাদ্রাজের কোন পল্লী থেকে আনা হয়েছে। সাতটা আনা হয়েছিল। তিন দিনেই ছটা বিক্রি হয়ে গেছে।

মূর্তিটা কেনা হল। তা ছাড়াও দিলীপ মেয়েদের রুমাল কিনল আধ ডজন। অবশ্য কাজলের পছন্দ মত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দুজনে কেনাকাটা শেষ করে বাইরে এসে দাঁড়াল। সামনে দাঁড়ান একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে দিলীপ বলল, চলে আসুন।

কেন ট্রাম-বাসই তো ভাল ছিল। ভিড়ও এখন অনেক কম।

একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

কাজলকে উঠিয়ে দিয়ে দিলীপও পাশে বসল।

ওঠার একটু পরেই দিলীপ কথাগুলো বলল। আবেশ-বিহ্বল কণ্ঠ নয়। স্পষ্ট কথা। কাজলের একটা হাত নিজের দুহাতে চেপে আস্তে আস্তে বলল। কাজলকে তার দরকার, এক অফিসে পাশা-পাশি চেয়ারে নয়, একই ঘরে আরো কাছাকাছি। সহকর্মিনী আর নয়, সহধর্মিনী।

কাজলের সারা শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। নিমীলিত দুটি চোখ, বুকের স্পন্দন দ্রুততর। দিলীপের কাছ থেকে সরে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষটার আরো কাছেই সরে এল।

কোন্ সময় নিজের অজানিতেই কাজল দিলীপের বুকে মাথা রাখল। ঠিক এমন একটা লগ্নের অপেক্ষায় বুঝি সারাটা জীবন সে উন্মুখ হয়ে ছিল। অপমান, বাঁকা বাঁকা কথা, কুৎসিত ইঙ্গিত সব কিছু আজ মুছে একাকার। সামান্য দাগও কোথাও নেই। সব বেদনার ইতি।

দিলীপের কথাগুলো কাজলের কানে এল। দূরাগত বাঁশীর সুরের মতন।

বিয়ের পরে আর কিন্তু চাকরি করতে দিচ্ছিনা তোমাকে। ঘোমটা টেনে চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে। কেবল আমার সেবা করবে, কেমন ?

সাজান গোছান এক ঘরের ঘরনী, ঘরের মানুষটারই একান্ত, এমন জীবনই চিরকাল কাজলের কাম্য। প্রথম যৌবনে মনে মনে এমন একটা ছবিই সে এঁকেছিল। নিটোল এক নীড় আর মনের মানুষ। হুড়োহুড়ি করে পুরুষদের ভিড় ঠেলে দশটা পাঁচটা অফিস করার সাধ তার কোনদিনই ছিল না। বিধাতার নিষ্ঠুর তুলির এলোমেলো আঁচড়ে তার সে ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই এই কর্মব্যস্ত জীবন তাকে বরণ করতে হয়েছে।

কাজল দিলীপের বুকের কাছে আরো ঘন হয়ে বসল।

কি, কথা বলছ না যে ? দিলীপ ঝুঁকে পড়ল কাজলের দিকে।

আমি জানিনা যাও। কাজল লজ্জা ঢাকতে দিলীপের বুকেই মুখ লুকাল।

কাজলদের গলির মোড়ে আসতেই কাজল ট্যাক্সি থামাতে বলল। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলেই হাজার প্রশ্ন, হাজার কৈফিয়ত। পরাশরবাবু কপাল চাপড়াবেন। ওষুধের শিশি খালি, মালিশের কৌটোও তাই, অথচ মেয়ে ট্যাক্সিতে আসা-যাওয়া করছে। নবতারাও উঁকি ঝুঁকি দেবে জানলার ফাঁকে ফাঁকে। কি

ব্যাপার, চিরদিনের ট্রামে বাসে চলাফেরা করা মেয়ে আজ ট্যাক্সিতে যে !

তার চেয়ে কাজল মোড়েই নেমে যাবে।

ট্যাক্সির দরজা খুলে রাস্তায় পা দেবার মুখেই দিলীপের ডাকে কাজল ফিরে দাঁড়াল !

কাজল !

উঁ। কাজল সোজাসুজি চোখ তুলে চাইতে পারল না দিলীপের দিকে। দিলীপ রুমালের বাক্সটা এগিয়ে ধরল।

এ কার ?

লেডিস রুমাল নিশ্চয় আমার নয়। দিলীপ হাসল।

কিন্তু এ তো আপনি কিনেছেন—

বিশ্বাস কর, নটরাজ যার জন্য, রুমালগুলো তার জন্য কিনিনি।

হাত বাড়িয়ে কাজল রুমালের বাক্সটা নিল। হেসে বলল, নটরাজ কিনে দেবার মজুরী বুঝি ?

না, দিলীপ ঘাড় নাড়ল, কাজলের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, আমার মতন অপদার্থকে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতির দাদন।

ট্যাক্সির আলোর লাল বিন্দুটি মুছে না যাওয়া পর্যন্ত কাজল দাঁড়িয়ে রইল।

সামনের ঘরেই নবতারা বসে ছিল। কাজলের পায়ের আওয়াজে মুখ তুলল।

ধন্যি মেয়ে বাবা, এতক্ষণে আসার সময় হল। ভেবে মরি। উনি তো বিকেল থেকেই চেঁচামেচি আরম্ভ করেছেন। গেঞ্জি না কি আনবার কথা ছিল ?

গেঞ্জি ! সত্যিই তো, কদিন ধরে দুটো গেঞ্জির কথা পরাশরবাবু বলছিলেন। কাজল একেবারে ভুলে গেছে। অবশ্য আজ, আশপাশের সব কিছু ভুলে যাবারই দিন। প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি তুচ্ছ সব কথা।

পর পর তিন চারদিন কাজল অফিস থেকে বাড়ি ফিরল সন্ধ্যা পার করে। নবতারা অবাক। যে মেয়ে সাড়ে ছ'টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছোত, সে মেয়ে বাড়ি আসে সাড়ে আটটায়। কোনদিন ন'টাও বেজে যায়। জিজ্ঞাসা করলে কাজল মুচকি হেসে বলে, কাজ ছিল। এর বেশী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করাও যায় না। রোজগেরে মেয়ের মন রেখে চলতে হয়। যে গরু দুধ দেয় তার চাট সময়ে সময়ে খেতে হয় বৈকি।

একদিন কাজল ফিরল বেলা থাকতে। অফিসের ছুটি হবার আগেই বোধ হয় বেরিয়ে পড়েছে। সোজা এসে দাঁড়াল মায়ের সামনে।

একটা কথা আছে মা।

নবতারা কি একটা সেলাই করছিল, মেয়ের কথায় মেশিন থামাল। চোখ তুলে চেয়েই আশ্চর্য হল। খুশীতে মেয়ে যেন ঝলমল করছে। চোখে মুখে আনন্দ উপছে পড়ছে। সে খুশীর ছোঁয়াচ নবতারার মুখেও লাগল, কিরে, আবার বুঝি মাইনে বেড়েছে ?

মাইনে ? না, মাইনে আর কোনদিনই বাড়বে না। চাকরিই আর করবে না, তার মাইনে বাড়া। দিলীপের সামনাসামনি বসে দিনের পর দিন কাজ করতে ভারি লজ্জা করবে। ওগো, ফাইলটা দাও তো। কিংবা, 'মৌর্য পিরিয়ডের ভাস্কর্যের বিবরণ' বইটা যোগাড় করে দিতে পারবে গো।

কথাগুলো ভাবতেই কাজলের মুখ আতপ্ত। ছি, তা বুঝি আর পারা যায়।

একটু একটু করে কাজল মাকে সব বলল। দিলীপের কথা, মন নিবেদনের কাহিনী। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরেছে, একটু পরেই আবার বেরোতে হবে। দিলীপ অপেক্ষা করবে। মার্কেটিং। টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে। হাতে আর মাত্র চারটে দিন। হৈ চৈ, হাঙ্গামা নয়, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের বালাই না, চুপচাপ

পাশাপাশি দাঁড়ান। রেজিস্টারের সামনে। কালো কালিতে সই করার পরেই চুলের মাঝখানে লাল সিঁদুরের রেখা।

নবতারা চুপ করে শুনল। সব কিছু। পরাশরবাবুর পা কাটা যাবার খবর যেমনভাবে শুনেছিল, ঠিক তেমনিভাবে। তেমনি মুখের ভাব। অনেকক্ষণ পর খুব আস্তে বলল, তুই তাহলে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি কাজল ?

কাজল হাসল, বিয়ে হলে স্বামীর ঘর তো সব মেয়েই যায় মা ! তাছাড়া বেলঘরিয়া আর কতদূর। অফিসের তো আর বালাই থাকবে না। সময় পেলেই দুপুরবেলা পালিয়ে আসব।

বেলঘরিয়া ?

হ্যাঁ, আপাতত এক বন্ধুর খালি বাড়ি পাওয়া গেছে। পরে খোঁজ খবর করে অন্য কোথাও উঠে গেলেই হবে।

হাতের সেলাইয়ের কাজটা রেখে নবতারা উঠে পড়ল, যাই, খবরটা তোর বাবাকে দিয়ে আসি।

হ্যাঁ যাও, কাজলও সরে এল, আমি বাবার কাছে যেতে পারব না। কিছু বলতেও পারব না। ভারি লজ্জা করে আমার। আমি পালাই।

নবতারা পরাশরবাবুর ঘরে ঢুকতেই কাজল পা টিপে টিপে ফিরে এল। একটু পরেই কাপড় ছাড়লে চলবে। এখনও হাতে কিছু সময় আছে। তার আগে একবার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে আসবে। অনেকদিন বাপের মুখে খুশির ছায়া দেখেনি, আনন্দের ঝলক।

খুব সাবধানে কাজল পর্দার এপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রথমে ফিসফাস কথা। বাণী আর মন্টুর কান বাঁচিয়ে বোধ হয় দিলাপ আর কাজলের পূর্বরাগের কাহিনী। তারপর বিয়ের কথায় আসতেই নবতারা গলা চড়াল।

পর্দার এপাশে দাঁড়িয়েও কাজলের ভারি লজ্জা লজ্জা করল। দিলীপের নাম কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে দিলীপের

মুখ ভেসে এল। ব্যাক ব্রাশ চুল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। আজই দিলীপ বলেছে। একটা হাত দিয়ে কাজলের দুটো হাত চেপে ধরে।

বাইরের রঙে যারা হোঁচট খায় তারা মানুষ হিসেবে খুবই নিচুস্তরের। অনেক হাত মাটি খুঁড়লে তবে মেলে পালবংশের স্থাপত্যের নিদর্শন। দুর্গম পথ পার হয়ে গুহার মধ্যে ঢুকলে তবে পাওয়া যায় পাষাণে উৎকীর্ণ বৌদ্ধযুগের শিলালিপির আঁচড়।

হঠাৎ চড়া গলার আওয়াজে কাজলের স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল। পরাশর বাবুর গলা।

সর্বনাশ। বিয়ে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে? না না, এসব ছেলেমানুষী করতে বারণ করো। সংসার অচল হয়ে যাবে যে! সামনের মাসে মণ্টুর পরীক্ষা, তাছাড়া এদিক ওদিক থেকে বাণীর দু' একটা সম্বন্ধও আসছে। আশ্চর্য, মেয়েটার কোন একটা কর্তব্য-জ্ঞানও নেই। নিজের সুখ-সুবিধাটাই বড় হল।

পর্দায় পর্দায় সুর চড়তে লাগল। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

ধন্য দেশ যা হোক। এমন চেহারায় নাগরও জোটে। বারণ করে দাও। বিয়ের ব্যাপারে মোটেই আস্কারা দিও না।

চোখের সামনে পর্দাটা কেঁপে কেঁপে উঠল। মেঝেটাও যেন দুলছে। বিশ পাওয়ারের বাতি কমে যেন দশ ক্যাণ্ডেল। সব ঝাপসা, স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু দিলীপের মুখই নয়, গোটা একটা সংসার সার বেঁধে ফুটে উঠল চোখের সামনে। দৃঢ় কঠিন সব মুখ। সহানুভূতির লেশমাত্র নেই।

নিজের ঘরে ফিরে যেতে যেতেই বাপের গলার আওয়াজ কাজলের কানে গেল।

আমার ক্রাচ দুটো এগিয়ে দাও তো, আমি বোঝাচ্ছি গিয়ে। উঃ, কি স্বার্থপর মেয়ে! বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করে তুললাম, লেখাপড়া শেখালাম, তার এই পরিণাম। আজ বাপ-মা ভাই-বোন সব পর। এই অবস্থা সংসারের, আর এই সময়ে নিজের সুখ আর স্বাচ্ছন্দ, নিজের বিলাসিতার চিন্তাই বড় হল। ছি ছি ছি।

নবতারার গলার স্বর খুব অস্পষ্ট। হয়তো বোঝাবার চেষ্টা করছে কিংবা সায় দিচ্ছে স্বামীর কথায়।

তুহাতে কপালটা টিপে ধরে কাজল নিজের ঘরে ফিরে এল। চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজল।

চোখ বুজেও টের পেল দরজার সামনে মণ্টু আর বাণী এসে দাঁড়িয়েছে। এক সঙ্গে নয়, এক এক করে। হয়তো আবেদন জানাতে। বোঝাতে এই স্বার্থান্ধ দিদিকে। মণ্টুর পড়াশোনা। বাণীর বিয়ে। কিছু টাকা এদের সংসারে কাজল দিয়ে যেতে পারত। নিজের কষ্ট করে জমানো টাকা। কিন্তু তাতে এদের ক্ষুধা মিটবে না। কাজলের থাকা চাই এ সংসারে। নিজের সংসার পাতার মিথ্যা মোহ কাটিয়ে বাপ মা ভাই বোন সবাইকে বাঁচাতে হবে। কাজলের তিল তিল করে সংগ্রহ করা অর্থ দিয়ে এদের জীবনী-শক্তি বাড়াতে হবে, হয়তো বা নিজের জীবনীশক্তির বিনিময়ে।

বাঁচার এমন গৌরব থেকে নিজেকে কিছুতেই কাজল বঞ্চিত করবে না। নিজের সামান্য সুখ সুবিধার জন্য বৃহত্তর দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে, তা কি হয়!

মন ঠিক করে মাথা তুলতেই কাজলের কানে ক্রাচের শব্দ এল। ঠক্ ঠক্ ঠক্। পরাশরবাবু নিজে মেয়েকে বোঝাতে আসছেন।

আর কোন অসুবিধা নেই। কাজল মিথ্যা ভয় কাটিয়ে উঠেছে, ক্ষুদ্র স্বার্থ আর ব্যক্তিগত সুখকে অতিক্রম করেছে।

চোখ মুছে কাজল বাপের আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ। কাজলের মনে হল যেন এক যুগেরও বেশী। ক্রাচের আওয়াজ কিছুটা এগিয়েই থেমে গেল। বোধ হয় পরাশরবাবু মত বদলেছেন। মেয়েকে আর কিছু বোঝাতে চান না। বড় হয়েছে মেয়ে, লেখাপড়া শিখেছে। সবই বোধ হয় বুঝতে পেরেছে। অন্যায় কাজ একটা করতে যাচ্ছিল, সময় বুঝে সামলে নিয়েছে।

একটু পরে পর্দাটা দুলে উঠল। পরাশরবাবু নয়, নবতারা এসে দাঁড়াল কাজলের কাছে। টেবিলের ওপর মাথা রেখে কাজল চুপ করে বসেছিল, মাথায় স্পর্শ পেয়ে মুখ তুলল।

কাজল! নবতারার স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর।

কাজল কোন কথা বলল না। কথা বলবার কোন শক্তি ওর নেই। দুটো চোখ বিস্ফারিত করে মার দিকে শুধু চেয়ে রইল।

ওঁর কথা সবই শুনলি মা। আমি কি বলব বল্। বড় হয়েছিস্, লেখাপড়া শিখেছিস। বুঝতেই তো পারছিস তুই আমার ছেলের মত। তুই আছিস বলেই সংসার চলছে। তুই না থাকলে কি যে হবে ভাবতেও ভয় হয়, মা।

আমায় মাপ কর মা, অনেক চেষ্টা করেও কাজল গলা সহজ করতে পারল না। স্বরে কান্নার মিশেল, আমি ভুল করেছিলাম। নিজের সামান্য সুখের জন্য তোমাদের সবাইয়ের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি মা। তোমাদের কোন ভয় নেই।

নবতারা চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারপর আস্তে আস্তে সরে গেল।

সারারাত কাজল বিছানায় ছটফট করল। রাত নটা পর্যন্ত ভয় ছিল, হয়তো দিলীপ ওকে না পেয়ে খুঁজে খুঁজে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াবে। সিঁড়ি বেয়ে একেবারে উঠে এসে বসবে বাপের মুখোমুখি। কিংবা দরজার চৌকাঠ বরাবর এসে কাজলের নাম ধরে ডাকবে।

কি করবে কাজল! দিলীপের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কেমন করে সে থাকবে। অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও দিলীপের সামনে গিয়ে একবার দাঁড়ান উচিত। কথা হয় তো তাকে আর বেশি বলতে হবে না। যা বলবার পরাশরবাবুই বলবেন। ক্রাচে ভর দিয়ে মেয়েকে আড়াল করে দাঁড়াবেন। যে কথা মেয়েকে বলতে

এসেও ফিরে গেছেন, সেই কথা শোনাবেন দিলীপকে, মনের সমস্ত বিষ মিশিয়ে।

রাত হতে কাজল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অপেক্ষা করে করে দিলীপ ফিরে গেছে। বাড়ি অবধি ধাওয়া করার স্পৃহা আর তার হয়নি। কিন্তু কাজল কি করে মুখ দেখাবে দিলীপকে। দেখা না করার কি কৈফিয়ত দেবে!

জানলা দিয়ে রোদের ছটা মুখে চোখে পড়তেই কাজল উঠে পড়ল। অনেক বেলা হয়ে গেছে। সারা রাত ঘুমোয়নি, ভোরের দিকে একটু তন্দ্রার মতন এসেছিল। কপালের দুটো পাশ টনটন করছে। মাথাটা অসম্ভব ভারি। কাল রাতে কিছু খায়নি। বার দুয়েক নবতারা এসে দাঁড়িয়েছিল বন্ধ দরজার সামনে। ডেকেও ছিল কয়েকবার কিন্তু কাজল সাড়া দেয়নি। সাড়া দিতে তার ইচ্ছা হয়নি। রাগ নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা সকলের ওপর, সব কিছুর ওপর।

সকাল সকাল কাজল স্নান সেরে নিল। বাড়ির সকলের যেন একটু সন্ত্রস্ত ভাব। সবাই আড়চোখে দেখছে কাজলকে আর সরে যাচ্ছে। পরাশরবাবু ক্রাচে ভর দিয়ে এদিকে আসছিলেন, কাজলকে দেখে থতমত খেয়ে আবার ফিরে গেলেন। কাজের ছুতোয় নবতারা রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। মণ্টু আর বাণীকে ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না।

স্নান সেরে একটু সহজ হল কাজল। ক্লান্তির ভাবটা অনেক কম। মাথাধরাটাও নেই। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চেঁচিয়ে মাকে ডাকল। নবতারা কাছে আসতে বলল, আজ তাড়াতাড়ি ভাত চাই মা, একটু শীঘ্র বেরোব। অফিসে দরকার আছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত কাজল নিজেকে বেশ শক্ত রেখেছিল। খাওয়া দাওয়া সেরে জোরে হেঁটে রাস্তায় গিয়ে পৌঁছল, ভিড় ঠেলে ট্রামে উঠল কিন্তু অফিসের কাছাকাছি আসতেই বুকের মধ্যে দুরু দুরু ভাব, দুটো চোখ জলে ভরে এল। হয়তো দিলীপও আগেই

এসেছে। ওরই অপেক্ষায় বসে আছে দরজার দিকে মুখ করে। অফিসে পা দিলেই জিজ্ঞাসা করবে। কি ব্যাপার? জীবনে পরস্পরকে গ্রহণ করার আগেই এই চুক্তি ভঙ্গ!

অফিসে ঢুকে কাজল যেন বেঁচে গেল। দিলীপ আসেনি। তার চেয়ার খালি। ইতস্তত কয়েকজন কেরানী বসে আছে। কাজ শুরু করার আগে গল্পগুজবে মত্ত। কাজল নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। পার্টিশনের আড়ালে। মিনিট দশেক। তারপরই জুতোর খটখট শব্দ। এ আওয়াজ কাজলের অচেনা নয়। সারা দেহের রক্ত মুখে গিয়ে জমল। আঁচলের খুঁটটা হাতে চেপে কাজল ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

কাজল! দিলীপ একেবারে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজল চমকে মুখ তুলল। মুখ তুলেই অবাক। উস্কোখুস্কো চুল, বিবর্ণ মুখ, রক্তাভ দুটি চোখ। দিলীপ কি অসুস্থ, না, তারও কাজলের মতন নিদ্রাহীন রাত কেটেছে।

কাল আমি রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি কাজল। তারপর একবার ভাবলাম তোমার বাড়ি যাই, কিন্তু অত রাত্রে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছা হল না। কি হয়েছিল বল তো? বাড়িতে কারুর অসুখ বিসুখ নয় তো?

না, কাজল ঘাড় নাড়ল, সে সব কিছু নয়। সকলেই ভাল আছে।

তবে? দিলীপ আরো কাছে সরে এল।

এখন নয়, এখন নয়—কাজল কান্নায় ভেঙে পড়ল, সব বলব তোমাকে। অফিসের পরে সব তোমায় বলব। তোমায় বলতেই হবে। কয়েক ঘণ্টা ক্ষমা কর আমাকে।

কাজলের আচমকা কান্নায় দিলীপ বিস্মিত হয়ে কয়েক পা সরে গেল।

সারাটা দিন কাজল ফাইলের পর ফাইল ঘাঁটল। বই থেকে নোট নিল। একগাদা নক্সার ওপর চোখ বুলাল, কিন্তু ওই পর্যন্ত।

কাজ এগোল না। যা পড়ল তার একটি বর্ণও মগজে গেল না। দু'কানে ভেসে এল পরাশরবাবুর তীক্ষ্ণ গলার শব্দ, তাঁর ক্র্যাচের আওয়াজ। ওরই ফাঁকে দিলীপ কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করল, কোন রকমে দায়সারা গোছের উত্তর দিল কাজল। ক্লান্ত, কাতর গলায়।

বিকেলের দিকে একটা চিঠি হাতে করে দিলীপ আবার দাঁড়াল কাজলের টেবিলের সামনে।

পড়। চিঠিটা কাজলের সামনে রাখল।

কাজল দিলীপের দিকে একবার চোখ ফিরিয়েই চিঠির দিকে দেখল।

প্রফেসর বসাকের চিঠি। ব্যক্তিগত চিঠি দিলীপের কাছে। লিখেছেন, কাজ শেষ হয়ে গেছে। দিন চারেকের মধ্যে ফিরে আসছেন। দিলীপের চিঠি পেয়ে ভারি খুশি হয়েছেন। তাঁর কাছে এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কিছু হতে পারে না। দুজনেই তাঁর প্রিয় ছাত্র, দিলীপ আর কাজল। তাদের দুজনের শুভমিলন যে তাঁর কাছে কত সুখের তা চিঠিতে জানাবার নয়। তিনি দু-জনকেই আশীর্বাদ করছেন। সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে। বিবাহিত জীবন সুখের হোক। সত্যকে, সুন্দরকে, আনন্দকে আদর্শ রেখে যেন তারা জীবনে চলতে পারে, এই তাঁর কামনা। তিনি আশা করছেন বিয়ের দিনের আগেই তিনি ফিরতে পারবেন। যোগদান করতে পারবেন এই উৎসবে। দুজনকে কাছে ডেকে আশীর্বাদ করতে পারবেন।

চিঠির ওপর কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তেই কাজল সম্বিত ফিরে পেল। এত করে বুঝিয়েছে মনকে, নিজেকে শক্ত করেছে, কিন্তু পোড়া চোখ কিছুতেই বাধা মানে না।

দিলীপ অবাক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তারপর আস্তে আস্তে বলল, কি হয়েছে বল তো তোমার? আমার ব্যবহারে কি আঘাত পেয়েছ? আমার নিজেকে ভারি দোষী মনে হচ্ছে।

কাজল ঘাড় নাড়ল। হাত বাড়িয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিল দিলীপের দিকে কিন্তু চোখের জল অফুরন্ত ধারায় গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

পাঁচটা বাজতে আর মিনিট দশেক। চল বেরিয়ে পড়ি।

ফাইল গুছিয়ে দিলীপ দাঁড়িয়ে উঠল।

একটু সময় নিল কাজল। পিছন ফিরে চোখের জল মুছে নিল রুমাল দিয়ে। তারপর হাত-ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, চল।

দিলীপ এগিয়ে গেল। কাজল পিছন পিছন।

রাস্তা পার হয়ে, ভিড় কাটিয়ে দুজনে পার্কের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। ছোট ছেলেমেয়েদের জটলা। আয়াদের ভিড়। পার্কের মাঝামাঝি ঘাসের ওপর দুজনে বসল, পাশাপাশি। ইচ্ছা করেই কাজল কথা শুরু করল না। কথা বলতে গেলেই দরদর ধারে চোখের জল গড়িয়ে পড়বে। বাড়িমুখো কেরানীর দল হাসাহাসি করবে তাই নিয়ে। জটলা করে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। তার চেয়ে আর একটু অন্ধকার হোক। ফাঁকা হোক পার্ক। তারপর কাজল আরম্ভ করবে বুকভাঙা কাহিনী।

তাই করল কাজল। একটি একটি করে বেদানার দানা ছাড়াবার মতন একটু একটু করে সব বলল। বিরাট একটা সংসারের ভার তার ওপর। পঙ্গু বাপ আর নাবালক ভাইবোন। তাদের অতল জলে ভাসিয়ে নিজে নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখাও পাপ। নিজে সুখের আবেশে বিভোর থেকে এ কথাটা কাজল ভুলে গিয়েছিল। কাল পরাশরবাবু মনে করিয়ে দিয়েছেন। রূঢ় আঘাতে বাস্তবের কঠিন মাটিতে নামিয়ে এনেছেন কাজলকে।

চুপ করে দিলীপ শুনল। মাথা হেঁট করে। তারপর কাজল থামতে প্রায় অস্ফুট গলায় বলল, আমি যদি তোমাদের গোটা সংসারের ভার নিই কাজল। যদি দরকার হয় অফিসের পরে কোন কলেজে কাজ নেবো, কিংবা ইতিহাসের টিউশনি।

কাজল একবার দিলীপের দিকে চাইল। পলকের জন্য।

সেটুকুর মধ্যেই তার জল-চকচক চোখ দিলীপের নজর এড়াল না।

না দিলীপ, আমি শুধুই তোমাকেই চেয়েছিলাম, শুধু একান্ত করে তোমাকে। তোমার সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে আমার মা-বাপ ভাইবোন বাঁচবে, নিজেকে এত ছোট আমি করতে পারব না। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই এত নিচে নামাবে না।

আমাকে ভুল বুঝো না কাজল, সেভাবে আমি কথাটা বলিনি, দিলীপ কাতর অনুনয় করল, তোমাকে পাবার চিন্তাটা এত বড় হয়ে উঠেছে যে তার পাশে অন্য কোন চিন্তা ঠাঁই পায়নি। বেশ, তাহলে এমন তো হতে পারে, তুমি কাজ ছাড়বে না, তাহলে তো কোন অসুবিধা নেই।

কাজল ম্লান হাসল। বেদনায় নিংড়ান হাসি। ধীর গলায় বলল, তুমি তো তা চাওনি দিলীপ। তোমার মনের কথা তো জেনেছি, তুমিই জানিয়েছ। সহধর্মিনী সহকর্মিনী হবে না। তোমার সে স্বপ্ন ভেঙে দেবার আমার কোন অধিকার নেই। তোমাকে হারানো আমার মত মেয়ের পক্ষে যে কতখানি তা তুমি বুঝবে না দিলীপ। আমার সমস্ত পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে যাবে। সব রঙ, সব রস মুছে যাবে। তুমি আমাকে সাহস দাও দিলীপ। তুমি জোর গলায় বল, সংসারের কর্তব্য থেকে যেন বিচ্যুত না হই। তোমাকে কাছে নাই বা পেলাম, তুমি যেন আমার মন জুড়ে থাক। সারারাত নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হয়েছি, তুমি আর আমাকে দুর্বল কর না।

দিলীপ হাত বাড়িয়ে কাজলের একটা হাত টেনে নিল। বলল তুমি বুঝি মন ঠিক করেই এসেছ কাজল। আমাকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছ।

খুব সাবধানে কাজল হাতটা ছাড়িয়ে নিল। একটু সরে বসল দিলীপের কাছ থেকে।

চল আজ ওঠা যাক। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, দিলীপ

শেষ চেষ্টা করল, তুমি বরং সময় নাও কয়েকদিন। আজ তুমি উত্তেজিত, কি বলছ তাই বোধ হয় জান না। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। মন ঠিক হলে আমায় ব'ল।

দিলীপের এত কথার কাজল কোন উত্তর দিল না। কেবল বলল, তুমি এগোও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ দিলীপ অপেক্ষা করল। কথা বলার কোন চেষ্টা করল না, তারপর কি ভেবে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। চলতে চলতেও বার কয়েক ফিরে ফিরে দেখল কাজলের দিকে। এক সময়ে গেট পার হয়ে বাইরের জনতার সঙ্গে মিশে গেল।

যতক্ষণ দেখা যায় কাজল একদৃষ্টে দিলীপের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর মানুষটা মিলিয়ে যেতেই দু হাঁটুতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সারাক্ষণ বুঝি কেবল অভিনয় করেছে কাজল। দিলীপকে সামনে বসিয়ে নিজে যা নয়, তাই প্রকাশ করার চেষ্টা করেছে। পরের সংসারে কোন আকর্ষণ নেই কাজলের। ছেলেবেলা থেকে তার নীড় বাঁধার সাধ। নীড় বাঁধার এই স্বপ্ন বারবার ভেঙে গিয়েছে লোকেদের রূঢ় আচরণে। দেখতে আসায় ছল করে ইনিয়ে বিনিয়ে যারা কেবল আঘাত দিয়ে গেছে।

এতদিন পরে একজন এগিয়ে এল মনের সামনে। ব্যাকুল বাহু মেলে কাছে ডাকল কাজলকে। সব কিছু পিছনে ফেলে তার ছুটে যাবার কথা, কিন্তু সংসার তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল অক্টোপাশের মতন। তার হাড় মাংস নিষ্পেষিত করল, মনকে চুরমার করে দিল। একটু আকাশ নেই, বাতাস নয়, চারদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার। সব ছেড়ে ছুটে পালিয়ে যাবার মতন মনের বলও অবশিষ্ট নেই।

হঠাৎ ভারি জুতোর শব্দ হতেই কাজল মুখ তুলল। পার্কের চৌকিদার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

কেয়া হুয়া ? শুষ্ক, কঠিন কণ্ঠস্বর।

শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে কাজল দাঁড়িয়ে উঠল। জোর পায়ে হেঁটে পার্কের বাইরে চলে গেল।

পর পর দুদিন কাজল অফিসে গেল না। বাড়িতে ঠিক সময়ে খেয়ে সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়ল। প্রথম দিন পথে পথে ঘুরল। গড়ের মাঠে কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ গঙ্গার ধারে। ফেরবার সময় বাপের জন্য এক গাদা ওষুধ কিনল। মালিশ, মিকশ্চার, টনিক। দ্বিতীয় দিন ন্যাশনাল লাইব্রেরি গিয়ে কিছুটা সময় কাটাল। পুরাতত্ত্বের ভারি ভারি বই সামনে টেনে নিয়ে পড়ার ভান করল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ফড়িং আর প্রজাপতির হালকা হাওয়ায় ডানা মেলে দিয়ে ভেসে বেড়ানো দেখল। তারপর হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু কতদিন এমনি করে কাজল দিলীপকে এড়িয়ে যাবে!

পরের দিন কাজল একটু সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরোল। অফিসে গিয়ে দুদিন ছুটির একটা দরখাস্ত দিলেই হবে। অসুবিধা কিছু নেই। এমনিতে কামাই সে করেই না। কিন্তু বিধি বাদী। মাঝপথে ট্রামের কারেণ্ট খতম। আধঘণ্টার ওপর বসে থাকল।

অফিস পৌঁছল প্রায় এগারোটা দশে। দিলীপের সিট খালি। দিলীপও কি কদিন অফিসে আসছে না! কাজলের মতন তারও বুঝি লজ্জা করছে মুখোমুখি দাঁড়াতে।

চেয়ারে বসতেই খবর পেল। বেয়ারার মারফৎ। প্রফেসর বসাক ফিরেছেন। কাজল দাঁড়িয়ে উঠল। কাজ শুরু করার আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসা উচিত। হয়তো তিনি ইতিমধ্যে সবই শুনেছেন, কিংবা হয়তো শোনেননি। যাই কিছু হোক, তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। উটপাখীর মতন বালিতে মুখ গুঁজে থাকলে সমস্যার সমাধান হবে না।

প্রফেসর বসাকের কামরা বরাবর গিয়েই কাজল থেমে গেল। আরো কে একজন রয়েছে ভিতরে। খুব চাপা গলায় কথা বলছে।

এক-পা তু-পা করে কাজল দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতরের লোকটা বাইরে এলেই সে যাবে। একটু দাঁড়াতেই কথার কিছুটা কানে গেল। দিলীপের গলা। মাঝে মাঝে প্রফেসর বসাকের গলাও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর গলা এত আস্তে, কথাগুলো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

আমাকে সেখানেই বদলী করে দিন স্যর। আমি ঝাড়া হাত-পা কোন পিছটান নেই। তারপর আপনি যখন বলছেন যে খোঁড়ার কাজ এখনও শেষ হয়নি, আপনার যখন ধারণা, একটা পুরোনো নগর ঘুমিয়ে আছে মাটির তলায়, সে কাজের ভার আমায় দিন।

প্রফেসর বসাক খুব চাপা গলায় কি উত্তর দিলেন।

না, না, দিলীপ গলা একটু বাড়াল, আমার কোন কষ্ট হবে না। তাছাড়া এ ধরণের কাজ আমার খুব ভালই লাগবে। সোসাইটি? সোসাইটির আমার কি প্রয়োজন স্যর। এই নিয়েই দিব্যি আমার সময় কেটে যাবে। তার ওপর যদি আপনার আশীর্বাদ থাকে, খেটে খুটে একটা থিসিসও লিখে ফেলতে পারি। এ বিষয়ে আপনিও আমাকে বহুবার উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমাকে যে রকম করে হোক এখান থেকে বদলী করে দিন স্যর।

শেষদিকে দিলীপের গলাটা ভেঙে পড়ল।

আবার প্রফেসর বসাক কি বললেন। বোধ হয় প্রিয়তম ছাত্রের অনুরোধে সম্মত হলেন।

নিশ্বাস রুদ্ধ করে কাজল প্রতিটি কথা শুনল। দিলীপ বাইরে বেরিয়ে আসার আগে কাজলের একটু সরে যাওয়া দরকার। যেন চোখাচোখি না হয়। কিন্তু জ্ঞান নেই কাজলের। সেকথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল।

খেয়াল যখন হল দিলীপ একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে।

তু' একটা মুহূর্ত, তারপরই দিলীপ নিজেকে সামলে নিল। তুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে অল্প হেসে বলল, নমস্কার মিস মুখার্জি, তুদিন আসেননি, শরীর ভাল ছিল তো?

কাজল ঘাড় নাড়ল অর্থহীনভাবে। কোন রকমে পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

প্রফেসর বসাক ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে একটা মূর্তির ভাঙা অংশ নিবিড় মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন, পায়ের শব্দে মুখ তুললেন।

এস কাজল।

কাজল ধীরে পায়ে চেয়ারে গিয়ে বসল, কবে ফিরলেন স্যর?

কাল, কাল ফিরেছি, হাত দিয়ে টেবিলের ওপর জড়ো করা কাগজপত্রের বাণ্ডিল সরাতে সরাতে বললেন, চমৎকার সব জিনিসের সন্ধান পেয়েছি। আমার মনে হয় যে সব মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে এ দেশের ইতিহাসে নতুন আলোকপাত হবে, নতুন অধ্যায় সংযোজিত হবে। তবে আমার ধারণা, এখনও বহু জিনিস অনাবিষ্কৃত রয়েছে। আমি সরকারের কাছে নোট পেশ করেছি। কোন অভিজ্ঞ লোকের তত্ত্বাবধানে খননকার্য চালান উচিত। অনেক নতুন জিনিস পাওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

কাজল একমনে মাথা নিচু করে বসে বসে শুনল। ঠিক যেমনি-ভাবে এক সময় ক্লাসে প্রফেসার বসাকের লেকচার শুনত।

হঠাৎ কথা থামিয়ে প্রফেসার বসাক সোজাসুজি কাজলের দিকে চাইলেন, কি ব্যাপার, তোমার চেহারা যেন একটু খারাপ লাগছে?

চেহারা? না, ভালই তো আছি। কাজল ম্লান হাসল।

তোমার সেই নোটটা তৈরি হয়ে গেছে বোধ হয়? পাল বংশের মন্দিরের শিল্প-পদ্ধতি?

প্রায় শেষ। যেটুকু বাকি আছে আজই শেষ করতে পারব।

কাজল আর অপেক্ষা করল না। উঠে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। দিলীপ নেই। বোধ হয় বাইরে কোথাও গেছে। ইচ্ছা করেই কাজলকে এড়িয়ে চলেছে সেটুকু বুঝতে তার মোটেই অসুবিধা হল না।

শুধু সামনে থেকেই নয়, এদেশ থেকেই দিলীপ সরে যাবার চেষ্টা করছে। নিজের কানে কাজল সবই শুনেছে।

দিলীপ ফিরল বিকেলের দিকে। কিন্তু নিজের টেবিলের ধারে কাছে গেল না। সোজা ঢুকল প্রফেসার বসাকের কামরায়। ছুটির আগে বেরোল না।

দিন তিনচার দিলীপ অফিসে এল না। বলি বলি করেও কথাটা কাজল প্রফেসর বসাককে জিজ্ঞাসা করতে পারল না। এটুকু আন্দাজ করতে পারল, তিনি সবই জানেন। দিলীপ আর কাজলের মিলনের কাহিনী। দুজনের সরে যাওয়ার অধ্যায়টুকুও নিশ্চয় শুনেছেন দিলীপের কাছে। বুদ্ধিমান লোক। কাজলকে কিছু বললেন না। তা না বলুন, ভুল বুঝবেন না তো তাকে? সংসারকে ডিঙিয়ে কেন এগিয়ে আসতে পারেনি দিলীপের হাতে হাত রাখতে, তার আসল কারণটা উপলব্ধি করতে পারবেন না?

দুপুরের দিকে প্রফেসর বসাক নিজেই এলেন কাজলের টেবিলে। কাজল একমনে কাজ করছিল, পিঠে আলতো হাতের স্পর্শে ফিরে দেখল।

হাতের কাগজের বাণ্ডিলটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে প্রফেসর বসাক বললেন, সময় করে লেখাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিও। প্রেসে দেবার আগে একবার দেখা দরকার। কিছুটা দিলীপই দেখেছিল, এবার বাকিটা তুমি দেখে দাও।

এমন সুযোগ কাজল ছাড়ল না। কাগজের বাণ্ডিলটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, দিলীপবাবু কদিন আসছেন না, শরীর খারাপ হয়নি তো?

প্রফেসর বসাক ঘাড় নাড়লেন, না, না, সে সব কিছু নয়। বাইরে যাবার আগে কদিন ছুটি নিয়েছে। যাবার গোছগাছ করতে হবে তো।

কথাগুলো ঠোঁটের ডগায় এলেও কাজল নিজেকে সামলে নিল। কোথায় সে যাবে কাজলের তো অজানা নয়। কেন যে যাবে তাও তো জানে। মিছামিছি কথা বাড়িয়ে লাভ!

তবু কাজল খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করল, উনি কবে যাচ্ছেন ?

পরশু। পরশু রাত আটটায় গাড়ি।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। প্রফেসর বসাক একদৃষ্টে দেখলেন কাজলের দিকে চেয়ে, তারপর নিরাসক্ত গলায় বললেন, আমি স্টেশনে যাব, তুমি যাবে কাজল ?

বুকের মধ্যে অব্যক্ত একটা বেদনা। রক্তের সমুদ্রে তীব্র আলোড়ন। দু' কানে হাজার ঝিঁঝির শব্দ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কাজল নিজেকে সামলাল। সংযত গলায় বলল, আমার যাওয়া যদি দরকার মনে করেন তো যাব।

দরকার অদরকারের কথা নয়, এত দূরে চলে যাচ্ছে দিলীপ, আমাদের উচিত বৈকি তাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসা।

কাজল কোন কথা বলল না। কাগজের বাণ্ডিল খুলে বসল। আর সোজাসুজি চাইতে পারবে না প্রফেসর বসাকের দিকে দিলীপের সম্বন্ধে আর কিছু সে শুনতে পারবে না।

কিন্তু তাতেই কি রেহাই আছে। কাগজের প্রতি ছত্রে দিলীপের হাতের লেখা। লাল পেন্সিলে মার্জিনে দু' এক জায়গায় নিজের মন্তব্য লিখেছে। টকটকে লাল রঙ। জানলার বাইরের কৃষ্ণচূড়া ফুলের সঙ্গে এ রঙের যোগ আছে।

সকাল থেকে কাজল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করল। ছুটির দিন, অফিস যাবার হাঙ্গামা নেই। আজ রাত আটটার গাড়িতে দিলীপ বাইরে যাবে। প্রফেসর বসাক স্টেশনে তুলে দিতে যাবেন। কাজলের যাওয়া দরকার। কিন্তু কিছুতেই নিজের মনকে কাজল বুঝিয়ে উঠতে পারছে না। যখনই মনে পড়ছে যে দিলীপের সরে যাওয়ার কারণ কাজল নিজে, তখনি তার দুটো চোখ জলে ভরে আসছে।

গেলে হয়তো ভেঙে পড়বে কাজল, বুক ভাসাবে দু' চোখের জলে, কিন্তু না যাওয়াটা ভারি দৃষ্টিকটু ঠেকবে, অন্ততঃ প্রফেসর

বসাকের কাছে। এত অল্পে ভেঙে পড়লে চলবে কেন। সারা জীবন কাটাতে হবে এই স্মৃতি মন্থন করে। রুক্ষ ধু ধু মরুভূমি, সবুজের সামান্য ইসারাও নেই কোনদিকে।

অনেক ভেবে কাজল স্টেশনে যাওয়াই ঠিক করল।

সন্ধ্যা হতেই কাজল মণ্টুকে কছে ডাকল।

এই মণ্টু, বেড়াতে যাবি?

মণ্টু একমনে নিজের পড়ার বইয়ের ছেঁড়া পাতা জোড়বার চেষ্টা করছিল। একটু আগে খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছে বাণীর সঙ্গে। বাণীর মাথার কয়েক গাছা চুল এখনও ওর হাতের মুঠোয়, আবার ওর নতুন কেনা গুল্‌তিটাও তেমনি পাশের বাড়ির খোলার চালের ওপর। ওর বইয়ের গোটা দুয়েক পাতাও ছিন্নভিন্ন।

তাড়াতাড়ি বই সরিয়ে মণ্টু দিদির কাছে এসে দাঁড়াল। একেবারে অপ্রত্যাশিত আহ্বান। কালেভদ্রে দিদির সঙ্গে বেরোতে পায়, তাও কাজে। হয় দর্জির দোকানে জামার মাপ দিতে কিংবা ধারে কাছে কোথাও নিমন্ত্রণে। কিন্তু এবারের আহ্বান বেড়াতে যাবার। তাছাড়া এমন মাহেন্দ্রক্ষণে দিদির হাত ধরে সেজেগুজে যদি বেড়াতে যেতে পারে বাণীর নাকের ওপর দিয়ে, তবে চরম প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সব অপমানের ইতি।

আমি একলা যাব দিদি? সামান্য একটু সন্দেহ। দিদির খেয়ালের কথা কিছুই বলা যায় না। শেষ মূহূর্তে হয়তো বাণীকে ডেকে বসবে।

হ্যাঁ, তুই আর আমি। কাজল উত্তর দিল।

মণ্টু আর একটুও সময় নষ্ট করল না। পোষাক বদলাতে ভিতরে ছুটে গেল। কাজলও তৈরি হয়ে নিল। তার আর তৈরি কি। সাধারণ একটা শাড়ি আর ব্লাউজ। মুখে হাল্‌কা পাউডারের প্রলেপ। চামড়ার হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল।

ট্রামে উঠেই মণ্টু জিজ্ঞাসা করল, আমরা কোথায় যাব দিদি? মার্কেটে?

না, স্টেশনে। কাজলের গলা অস্বাভাবিক গম্ভীর।

স্টেশনে? স্টেশনে কেন দিদি? মণ্টুর উৎসাহের অন্ত নেই।

আঃ, চুপ করে বস। ট্রামে বাসে কথা বলতে নেই। কাজল ধমক দিল। মণ্টু আর কোন কথা বলল না।

সোজা স্টেশনে নয়, কাজল মাঝপথে নামল। মণ্টুর হাত ধরে রাস্তা পার হয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

সার সার দোকান। ফুলের। নানা রঙের, নানা জাতের। কাজল এগিয়ে যেতেই দোকানীরা একসঙ্গে চেঁচাতে লাগল।

বেছে বেছে কাজল এক গোছা রজনীগন্ধা কিনল।

আবার ট্রামে ওঠার মুখে মণ্টু সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, ফুল কার জন্য কিনলে দিদি?

যে ভদ্রলোক চলে যাবেন গাড়ি করে, তাঁর জন্য। কাজল খুব শান্ত গলায় বলল।

কে চলে যাবেন দিদি?

তুমি তাঁকে চিনবে না। আমাদের সঙ্গে কাজ করেন।

তোমার সঙ্গে কাজ করেন তো চলে যাচ্ছেন কেন দিদি?

সেই প্রশ্নই সকাল থেকে হাজার বার নিজেকে কাজল করেছে। সরে যাবে কেন দিলীপ। এমন করে নিজেকে কষ্ট দেবার তার কি প্রয়োজন ছিল। কাজল কদিন ধরে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে খবরের কাগজের পাতা। কোন একটা চাকরি খালির খবর যদি নজরে পড়ে। যে কোন ধরণের চাকরি। বেসরকারী কলেজের অধ্যাপনা। হোক মাইনে কম, দুবেলা ট্যুইশনি করে কাজল ঘাটতি পূরণ করবে। সংসারের কোন অভাব রাখবে না। নিজেকে নিষ্পেষিত করে সংসারের অনটন মেটাবে। দিলীপের সরে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল।

মাঝে মাঝে একথাও কাজলের মনে হয়েছে। দিলীপকে বুঝিয়ে বলবে। কাজলই চোখের সামনে থেকে সরে যাবার চেষ্টা করছে।

দিলীপের কোথাও যাবার দরকার নেই। কিন্তু দিলীপ আর অফিসেই আসছে না। প্রফেসর বসাক কিংবা কারো কাছে খোঁজ করে দিলীপের মেসেও কাজল দেখা করতে পারত। অসুবিধা কিছু নেই। নির্ঝঞ্ঝাট। আলাদা ঘরে একলা মানুষ দিলীপ। অনায়াসেই কথাগুলো বলা চলত। তৃতীয় ব্যক্তির উপদ্রবের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু কাজলের সাহস হয় নি। দিলীপের কাছাকাছি নিরালায় দেখা করার মতন সাহস কাজলের নেই। দিলীপের সান্নিধ্যে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। সংসার তার সব কুশ্রীতা নিয়ে মুছে যায়। পঙ্গু বাপ, পর-নির্ভর গোটা সংসারের মানুষগুলো ধুয়ে মুছে একাকার। মনে হয় ধারে কাছে আর কেউ নেই। শুধু দিলীপ আর কাজল। হৃদয় বড় দুর্বল। তেমনভাবে যদি দিলীপ কাছে ডাকে, সব ফেলে হয়তো ছুটে চলে যাবে কাজল। কোন বাধাকেই আর বাধা বলে মানবে না।

কিন্তু তারপর! বাপের অভিশাপে, সকলের ধিক্কারে কাজলের নতুন গড়ে তোলা সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তিলমাত্র সুখ পাবে না।

তখনও প্ল্যাটফর্মে কেউ আসেনি। মণ্টুকে নিয়ে কাজল একটা বেঞ্চে বসল। মিনিট দশেক, তারপরই প্রফেসর বসাক এলেন। দূর থেকে কাজলকে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে এলেন।

কতক্ষণ? এটি কে? প্রফেসর মণ্টুর গাল টিপে আদর করলেন।

তা প্রায় দশ মিনিট। এটি আমার ভাই মণ্টু।

এমন একটা পরিচয়ে মণ্টুর বোধ হয় ঘোরতর আপত্তি। ঘাড় নেড়ে দিদিকে সংশোধন করে বলল, আমার নাম অতনু মুখোপাধ্যায়।

প্রফেসর বসাক উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন। কাজলও।

প্রফেসর বসাক কাজলের দিকে ফিরে বললেন, কি ব্যাপার, যাকে তুলে দিতে এলাম তারই খোঁজ নেই। যা ভুলো মন দিলীপের, অন্য কোন গাড়িতে উঠে বসল না তো?

হাসতে গিয়েও কাজল তেমনভাবে হাসতে পারল না। আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। দিলীপেরই কথা।

এক বন্ধুকে বিদায় দিতে স্টেশনে এসেছিল দিলীপ, পুরনো এক টাইম টেবলের ওপর নির্ভর করে। ফলে তার প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোবার দু'ঘণ্টা আগে বন্ধুকে নিয়ে ট্রেন ছেড়ে গিয়েছিল। তেমন যদি আবার হয়। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর দিলীপ এসে হাজির হয়।

কি আর হয় তাহলে? বড় জোর আজকের ট্রেনে আর দিলীপের যাওয়া হয় না। কিন্তু আজকের ট্রেনই তো শেষ ট্রেন নয়। কাল ট্রেন আছে, তার পরের দিনও। যাবার জন্য যে মানুষটা মন ঠিক করে ফেলেছে, তাকে ভুল টাইম টেবলই বা আর কতদিন আটকে রাখতে পারে। চলে সে যাবেই।

দিলীপ এল ট্রেন ছাড়বার মিনিট পনের আগে।

কাজলকে স্টেশনে হয়তো সে আশা করেনি, তাই কাজলকে দেখে একটু বিব্রত হল। কিন্তু দু'এক মিনিট, তারপরই সামলে নিল নিজেকে।

আরে, আপনি আবার এসেছেন কষ্ট করে?

কাজল কোন উত্তর দিল না। কথা বললেন প্রফেসর বসাক, কি ব্যাপার হে? আমরা ভাবলাম বুঝি তুমি মত বদলালে। যাওয়া নাকচ করে দিলে।

এক মুহূর্তের জন্য দুটো চোখ যেন চকচক করে উঠল দিলীপের। অন্ততঃ কাজলের তাই মনে হল, কিন্তু পরক্ষণেই দিলীপ হেসে উঠল, লক্ষ্মীছাড়ার সংসারেও যে একটু একটু করে কম আবর্জনা জমে ওঠে না, এ কদিন সংসার তুলতে গিয়ে সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম স্যর। ফেলে, ছড়িয়ে, বিলিয়েও শেষ করতে পারলাম না।

কাজলেরই প্রথম চোখে পড়ল। কামরার সামনে ঝোলানো কার্ডটা দেখে বলল, এই যে এই কামরা।

দরজা খুলে সবাই গিয়ে উঠল। একটু সময় গেল জিনিসপত্র ঠিক করে রাখতে, কুলির হিসাব মেটাতে।

তুমি পৌঁছেই আমাকে চিঠি দিও দিলীপ। প্রফেসর বসাক দিলীপের হাতব্যাগটা সরাতে সরাতে বললেন, আমিও ওখানে চিঠি দিয়েছি, তোমাকে নিতে ওরা স্টেশনে আসবে।

দিলীপ শুধু মুখ তুলে প্রফেসর বসাকের দিকে চাইল। কোন উত্তর দিল না। কাজলের দিকে ফিরে বলল, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

একটু ইতস্তত করে কাজল বসে পড়ল, দিলীপের পাশেই। এ ছাড়া আর উপায়ও ছিলনা। সারা কামরায় তুটি সিট। অন্য সিটটি অধিকার করেছেন এক মাড়োয়ারী প্রৌঢ়। শুধু অধিকারই নয়, বিছানাপত্র বিছিয়ে দেহভার এলিয়ে সে অধিকার কায়েমী করেছেন।

ঠিক এই সময়ে প্রফেসর বসাক এক অদ্ভুত কাজ করলেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ মণ্টুর দিকে ফিরে বললেন, চল অতনুবাবু, আমরা একটা জিনিস কিনে নিয়ে আসি। এখনি আবার গাড়ি ছেড়ে দেবে।

কাজল আর দিলীপকে কোন অবসর না দিয়েই প্রফেসর বসাক নেমে গেলেন মণ্টুর হাত ধরে।

তু'এক মিনিট দারুণ অস্বস্তি। কাজলই প্রথম কথা বলল, তুমি তো আমাকে ভুল বোঝনি দিলীপ, এ কথা ভাবনি যে ছল করে সংসারের দোহাই দিয়ে আমি পিছিয়ে গেছি।

দিলীপ মুখ তুলে ম্লান হাসল।

আমাকে তোমার কাছে টেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি যে আমার জীবনের কত বড় সম্পদ তা তুমি বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের কুরূপা মেয়ে না হলে বুঝতে পারবে না।

প্রথমে আস্তে তারপর দিলীপ অল্প গলা চড়াল, এ সব কথা কেন বলছ কাজল? আজ কি এসব বলার কথা? তোমাকে না চিনলে কখনও অত অল্প আলাপে তোমাকে সঙ্গিনী করতে চাইতাম না। নিজের ছোট স্বার্থকে তুমি বড় করে দেখনি বলেই আমার কাছে

আসা তোমার সম্ভব হয়নি। এটা আমার চেয়ে ভাল করে বোধ হয় আর কেউই জানে না।

দিলীপ একটু থামল। জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে চেয়ে দেখল। একেবারে এদিকের কোণে বসাক আর মণ্টু। এক দোকানীর সঙ্গে কি নিয়ে দরাদরি চলেছে।

ডেকে ডেকে তো মানুষজনকে জিনিস বিলিয়ে দিচ্ছ, কাজল অস্ফুট গলায় বলল, আমায় কিছু দেবে না?

তোমায়? দিলীপ যেন একটু আশ্চর্যই হল। হাতে তুলে দিতে হবে এমন জিনিস বুঝি চায় কাজল। তেমন জিনিস কি আছে দিলীপের কাছে। তাছাড়া সকলকে যা দেওয়া যায়, তা কি কাজলকে দেওয়া চলে।

কিন্তু কাজলের দু'চোখে প্রত্যাশার ঝিলিক। কিছু একটা দেওয়া দরকার। হঠাৎই দিলীপের কথাটা মনে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে স্যুটকেশ খুলে জামাকাপড়ের তলা থেকে সন্তর্পণে বের করল।

অবাক হয়ে গেল কাজল। বলল, একি তুমি এটা দাওনি বিয়েতে?

দিলীপ হাসল, কই আর দিতে পারলাম। লোভী মন, অনেক ভেবে চিন্তে রেখেই দিলাম জিনিসটা।

সেই নটরাজের মূর্তি। কাজলেরই পছন্দ করে কেনা।

এটা তোমাকে দিলাম কাজল, মূর্তিটা দিলীপ কাজলের দিকে এগিয়ে দিল, তোমায় দেবার উপযুক্ত জিনিস কিনা জানি না, তবে তোমার পছন্দ করা।

মাঝপথেই দিলীপ থেমে গেল। আর কিছু বলতে সাহস হল না। নটরাজের মূর্তিটা বুকে চেপে কাজল চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। নিস্পন্দ। দু'চোখ থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

এস অতনু, গাড়ি ছাড়বে এইবার, জিনিসগুলো দিয়ে দাও। প্রফেসর বসাক কলরব করতে করতে কামরার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতে কমলালেবুর ছোট্ট ঝুড়ি।

প্রফেসর বসাকের গলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কাজল ঘুরে দাঁড়াল। আঁচল দিয়ে ঘষল দুটি চোখ। কোথাও যেন অশ্রুর একটি ফোঁটাও না থাকে

তারপর আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে নেমে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে।

দিলীপ নিচু হয়ে প্রফেসর বসাকের পায়ের ধুলো নেবার সঙ্গে সঙ্গে গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। মণ্টু আগেই নেমে দাঁড়িয়েছিল দিদির পাশে। প্রফেসর বসাকও নেমে পড়লেন।

গাড়ি চলতে শুরু করার সঙ্গে দিলীপ জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। হাতে রুমাল। হাতটা তুলতে গিয়েই কাজলের মনে পড়ে গেল। ফুলের গোছাটা দিলীপের পাশে রেখে এসেছে। হাতে আর তুলে দেওয়া হয়নি।

প্রথমে নজরে পড়ল নবতারার। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল, পায়ের শব্দে ফিরে চাইল।

হ্যারে কোথায় গিয়েছিলি? দশটা বাজে, সবাইয়ের খাওয়া দাওয়া সারা, তোদের ভাত কোলে নিয়ে বসে আছি।

কথার মাঝখানেই থেমে গেল, কাজলের হাতের মূর্তিটার ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, এটা কিনলি বুঝি?

কাজলের কিছু বলবার আগেই মণ্টু কথা বলল, না মা, যে ভদ্র-লোক চলে গেলেন তিনি দিয়ে গেছেন দিদিকে।

কাজল অবাক হল। নটরাজের মূর্তিটা দিলীপ ওর হাতে তুলে দেবার সময় তো মণ্টু ধারে কাছে কোথাও ছিল না। তবে সে জানল কেমন করে। অবশ্য জানাটা মোটেই আশ্চর্য নয়। কাজল শুধু ফুলের গোছা কিনেছিল তা তো মণ্টুর জানা, দিলীপের কাছ থেকে নামবার সময় মূর্তিটা হাতে করে নেমেছে কাজেই দিলীপের কাছ থেকেই এটা পেয়েছে। ফুলের বদলে মূর্তি। মনে মনেই মণ্টু হিসাব করল, দিদি বোধ হয় ঠকে নি।

কথাটা মণ্টু মুখ ফুটে বলেই ফেলল, তোমারই লাভ হয়েছে,

না দিদি? ভারি তো কটা ফুল, তার চেয়ে মূর্তিটা ঢের দামী।

কাজল দ্রুতপায়ে নবতারার পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেল। মণ্টুর আর কি দোষ! এ সংসারের অন্য সব প্রাণীর মতন সেও সব কিছু যাচাই করছে অর্থের মাধ্যমে। টাকা আনা পাই দিয়ে অনুভূতিরও বিচার করছে।

বাপের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় কাজল মূর্তিটা শাড়ির আঁচলের তলায় ঢেকে নিল। পরাশরবাবু হয় তো জেগে নেই, তবু সাবধান হওয়া ভাল। জেগে থাকলে ক্রাচে ভর দিয়ে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াবেন। মানুষের এই দুঃসময়ে ব্রোঞ্জের একটা মূর্তি কিনে আনার কি প্রয়োজন ছিল তার কৈফিয়ত তলব করবেন কিংবা এই মূর্তিটার দামের বিনিময়ে কত শিশি ওষুধ কেনা চলত তার হিসাব।

কাজল জোরে পা ফেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

শুধু অফিসই নয়, সমস্ত জীবন যেন ফাঁকা ঠেকল কাজলের।

দিলীপের জায়গায় আর একটি অল্পবয়সী ছেলে ঢুকল। সদ্য কলেজ ফেরত। কোন রকমে একবার কাজলের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়।

প্রফেসর বসাকই একদিন আলাপ করিয়ে দিলেন।

কাজল প্রফেসর বসাকের ডাকে তাঁর কামরায় ঢুকে দেখল ছেলেটি টেবিলের এক কোণে বসে কি লিখছে।

কাজল ঢুকতে প্রফেসর বসাক মুখ তুললেন, দিলীপের চিঠি এসেছে কাজল। ভালই আছে। খুব মন দিয়ে কাজকর্ম করছে'

খুব সাধারণ কথা, কিন্তু কাজলের সারা শরীরের রক্ত মুখে এসে জমল। ঘাড় নিচু করে টেবিলের ওপর কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল।

কথা বলল সেই অল্প বয়সী ছেলেটি, দিলীপদার কাজকর্মে

কোনদিন অবসাদ নেই। বই পেলে আগে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতেন।

তুমি চিনতে দিলীপকে? প্রফেসর বসাকের প্রশ্নে কৌতূহলের রেশ।

ইউনিভার্সিটির কে না চেনে দিলীপ ব্যানার্জিকে স্যর? পলিটিক্যাল সাএন্স আর পুরাতত্বে রেকর্ড নম্বর। তাছাড়া উনি আমার দাদার সঙ্গে পড়তেন। প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়িতে।

সব ভুলে কাজল মুখ তুলে চাইল। দিলীপকে চেনে ছেলেটি। অন্তরঙ্গ ভাবে। শুধু তাই নয়, তার গুণমুগ্ধ ভক্ত। কাজলের মনে হল পরিচয় না থাকলেও অলক্ষ্যে যেন একটা যোগসূত্র গড়ে উঠল তুজনের মধ্যে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাবে দিলীপের কলেজ-জীবনের কাহিনী।

প্রফেসর বসাক ছেলেটির কথার উত্তর দিতে গিয়েই কি ভেবে থেমে গেলেন। কাজলের দিকে ফিরে বললেন, কাজল, তোমার সঙ্গে অরবিন্দের আলাপ নেই? পাশাপাশি বসে যখন কাজ করতে হবে, তখন আলাপ পরিচয়টা থাকা উচিত।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে হাত যোড় করল, আমার নাম অরবিন্দ গাঙ্গুলী। তু'বছর হল পাশ করেছি।

কাজল প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত তুটো তুলল, বলল, নমস্কার, ভারি খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। আমি কাজল মুখার্জি। চেহারার সঙ্গে নামের এমন মিল সচরাচর দেখতে পাবেন না।

অরবিন্দ আপত্তি করার ধরণে ঘাড় নাড়ল। গম্ভীর গলায় বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয় হল বটে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ আলাপ আমাদের বেশীদিন বোধ হয় থাকবে না।

একটু বিচলিত হল কাজল। এ আবার কি কথা। ছেলেটি বলতে চায় কি?

ধীর গলায় কাজল বলল, তার মানে? আপনার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

অরবিন্দ এবার হাসল। সামান্য শব্দ করে, বলল, আপনি দিয়ে শুরু করলে সে আলাপের বুনন খুব টেঁকসই হয় না। অল্প দিনেই ফেঁসে যায়। দোহাই আপনার, আমি বরং আপনাকে কাজলদি বলে ডাকব, আপনি আমাকে ওরকম আপনি মশাই করবেন না।

অরবিন্দর কথার ভঙ্গিতে প্রফেসর বসাক পর্যন্ত সশব্দে হেসে উঠলেন। টেবিল চাপড়ে বললেন, কথায় তুমি অরবিন্দের সঙ্গে পারবে না কাজল। কথা গাঁথা ওর ব্যাবসা। লুকিয়ে চুরিয়ে ও আবার কবিতা লেখে।

কথা শেষ করে প্রফেসর বসাক হাসিতে ভেঙে পড়লেন।

এক মুহূর্তে চাপ চাপ মেঘের ভার হাসির এক ফুৎকারে কোথায় মিলিয়ে গেল। অনেকদিন পরে কাজলও প্রফেসর বসাকের হাসির সুরে সুর মেশাল। পৃথিবীতে এত আলো আছে, এত হাসি আছে, একথা যেন সে ভুলেই গিয়েছিল।

রুমাল দিয়ে ঠোঁট চেপে বলল, ঠিক আছে অরবিন্দ, আজ থেকে আমি তোমার কাজলদি, তুমি আমার ছোট ভাই, কেমন ?

ছোট ছেলের মতন আনন্দে অরবিন্দ ঘাড় নাড়ল।

প্রফেসর বসাক এবার কাজের কথা পাড়লেন, অরবিন্দ, তুমি কাজ আরম্ভ কর গিয়ে। কাজলের সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে আমার।

অরবিন্দ কাগজপত্র গুছিয়ে বাইরে চলে গেল। কাজল বসল সামনের চেয়ারে।

প্রফেসর বসাক টেবিলে দু'হাতের ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, দিলীপ কেন এখান থেকে চলে গিয়েছে, আমি সবই জানি কাজল। আমি আসার পর এক রাত্রে আমার বাড়িতে গিয়ে সব কথাই সে আমায় বলেছে। তোমার দিকটাও যে আমি না বুঝি, এমন নয়। তোমার মতন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের জীবনে এ সংঘাত নতুন কিছু নয়। এ দেশের অলিতে গলিতে এমন মেয়ের

সন্ধান পাওয়া যায়। দধিচীর হাড়ে বজ্র তৈরি হয়েছিল শত্রু সংহারের জন্য, কিন্তু এসব মেয়েদের হাড়ে বিশল্যকরণীর গুণ। মৃতকল্প সংসারে নবজীবন দেয়, মরণাপন্ন মানুষের প্রাণে আশার রশ্মি জ্বালে। দিলীপ কাজ নিয়ে নিজেকে ভুলেছে। তাকে আমি বহুদিন থেকে জানি। অতীতকে ভুলতে হয়তো পারবে না, কিন্তু কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারবে, সে বিশ্বাস আমার আছে। আমি ভাবছি তোমার কথা। তোমাকেও শক্ত হতে হবে। যাদের জন্য দিলীপকে তুমি সরিয়ে দিলে শুধু তাদের নিয়ে তুমি বাঁচতে পারবে?

কাজলের যেন চেতনা নেই। চোখের সামনে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ ভেসে আসছে কানে। গলার কাছে জমাট-বাঁধা কান্না। প্রফেসর বসাক যে জানেন সব কিছু, তা কাজলের অজানা নয়, কিন্তু তিনি এমনভাবে এ কথা সোজাসুজি আলোচনা করবেন একদিন, তা সে কল্পনাও করেনি।

উত্তরের আশায় প্রফেসর বসাক কাজলের দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু কি উত্তর দেবে কাজল। দেবার মতন উত্তরই বা তার কি আছে!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কাজল আস্তে আস্তে বলল, আমার বাঁচা না বাঁচার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর নয় কি স্যর? আমার সংসার আমাকে আঁকড়ে রয়েছে, আমি সরে গেলে তার কি অবস্থা হবে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এ সংসারকে বাঁচিয়ে রাখতে তিল তিল করে রক্ত দিতে হবে আমাকে, এ ছাড়া আর কি কোন উপায় আছে!

কোন উপায় নেই?

আমি তো দেখছি না স্যর। যদি আমার বাবা পঙ্গু না হতেন, ভাই সাবালক হত, তাহলে হয়ত নিজেকে আমার এমন করে সংসারের সঙ্গে জড়াবার প্রয়োজন হত না। কিন্তু সারা সংসার যখন আমার উপার্জনের দিকে চেয়ে রয়েছে তখন তাকে বঞ্চিত করার অধিকার কি আমার আছে?

কিন্তু বিয়ের পর উপার্জন করা সম্ভব নয় এটা তুমি ভাবলে কেন ?

আমি ভাবিনি স্যর।

তবে ?

কাজল উত্তর দিল না। মাথা হেঁট করে রইল।

একটু থেমে প্রফেসর বসাক কাজলের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, ওঃ বুঝেছি, দিলীপের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল না যে বিয়ের পর তুমি রোজগার করতে বেরোও।

মাথা নিচু করেই কাজল ঘাড় নাড়ল, তারপর চমকে মুখ তুলল গভীর নিশ্বাসের শব্দে।

ছটো হাত টেবিলের ওপর রেখে চুপচাপ বসে আছেন প্রফেসর বসাক। মুখে চোখে চিন্তার ছাপ। কুঞ্চিত ভ্রূ। এমন একটা সমস্যার বুঝি সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর ছাত্র আর ছাত্রীর বিয়োগান্ত এই নাটকে নতুন কোন অধ্যায় যোজনা করে সর্বনাশের মোড় ঘোরানো সম্ভব কিনা তাই চিন্তা করছেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে কাজল উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় শুধু বলে গেল, যাচ্ছি স্যর, হাতে অনেক কাজ রয়েছে।

প্রফেসর বসাক নিরুত্তর। অনেক দূরের ক্যালেণ্ডারের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ। কাজল বাইরে চলে গেল।

অরবিন্দ কি একটা নোট লিখছিল, কাজল তার সামনে দিয়ে যেতে মুখ তুলে একটু হাসল। কোন কথা বলল না।

কথা হল টিফিনের সময়। অরবিন্দ বোধ হয় চা খেতে বাইরে গিয়েছিল, ফিরে চেয়ার টেনে কাজলের মুখোমুখি বসল।

কাজলদি আপনি বুঝি টিফিন আনেন না ?

কাজল হাসল, এর ওপর আবার টিফিন। দেখছ তো বিনা টিফিনেই চেহারাটা কি রকম জাঁদরেল হয়ে উঠছে !

কি যে বলেন, আপনার ধারণা আপনি বুঝি খুব মোটা ?

শুধু আমার নয় ভাই, বিশ্বজগতের ধারণা তাই।

কথাটা অরবিন্দ শুনেও শুনল না। অন্য প্রসঙ্গ শুরু করল, প্রফেসর বসাকের ঘরে শুধু দিলীপদার প্রশংসা করলাম বলে মনে করবেন না আপনার রেকর্ডের খোঁজ রাখি না?

কাজল মুচকি হাসল, কি খোঁজ শুনি?

'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারা' প্রবন্ধ লিখে আপনি ইউনিভার্সিটিতে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন, তাছাড়া এম-এ পরীক্ষায় একেবারে শীর্ষস্থান অধিকার।

থাম, থাম, কাজল অরবিন্দকে থামিয়ে দিল, যত বাজে খবর। কোথা থেকে এসব যোগাড় কর বলতো?

ফুল ফুটলে তার সৌরভ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বেই।

খুব হয়েছে। সকাল থেকে কাজকর্ম কিছু করেছ না এই সবই হচ্ছে।

কাজ কিছু কিছু অবশ্য এগিয়েছে, কিন্তু, অরবিন্দ মাথা চুলকাল, একটা কথা শুধু ভাবছি।

কি আবার ভাবছ?

ভাবছি দিলীপদা আর আপনি রিসার্চ না করে এসব কাজে মিথ্যা সময় নষ্ট করছেন কেন। ইদানীং অবশ্য দিলীপদার সুবুদ্ধি হয়েছে, গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, কিন্তু আপনি?

কাজল হাসল, তোমার দিলীপদার ঘাড়ে তো আর গোটা একটা সংসার নেই, কোন চিন্তাই নয়। কিন্তু আমার তো আর তা নয়।

তার মানে? আপনার ঘাড়ে বুঝি গোটা সংসার?

হ্যাঁ ভাই। মাঝারী সংসার, কিন্তু রোজগার করতে হয় আমাকে একলা। গবেষণা করতে গেলে মাসান্তে যে ক'টা টাকা পাব তাতে তো আর পাঁচজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে না ভাই।

শেষদিকে গলাটা আর্দ্র হয়ে উঠল কাজলের। আঁচলের খুঁটে দুটো চোখ মুছে নিল।

অরবিন্দ অপ্রস্তুত। লঘু মেঘ ভেবে পরিহাস শুরু করেছিল, ভাবেনি সে মেঘের বুকে এত জল।

সর্বনাশ ঘটল মাঝরাতে। আচমকা জোর শব্দে কাজলের ঘুম ভেঙে গেল। গুরুভার পতনের আওয়াজ। সেই সঙ্গে বাসন পড়ে যাওয়ার ঝনঝন শব্দ।

বিছানায় কাজল উঠে বসেছিল, নবতারার চীৎকারে ছুটে এল।

নবতারা পরাশরবাবুর ঘরের মধ্যে। দরজার গোড়ায় বাণী আর মণ্টু দাঁড়িয়ে।

কাজল চৌকাঠের কাছে আসতেই নবতারা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি কাজল, সর্বনাশ হয়েছে। টেনে তোলবার চেষ্টা কর।

কাজল দ্রুতপায়ে ঘরের মধ্যে এসেই থমকে দাঁড়াল।

মুখ গুঁজড়ে পরাশরবাবু পড়ে আছেন। ক্রাচ দুটো ছিটকে পড়েছে আলমারির কাঁচের ওপর। কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মেঝের চারদিকে ছড়ানো। নিস্পন্দ দেহ। সাড় তো নেইই, প্রাণ আছে কিনা তাও বোঝা গেল না।

বহু কষ্টে নবতারা আর কাজল ধরাধরি করে পরাশরবাবুকে খাটের ওপর তুলে শোয়াল। নাক আর মুখ দিয়ে চাপচাপ রক্ত। সমস্ত শরীর পাথরের মতন কঠিন।

ডাক্তার নিয়ে কাজল যখন ফিরে এল, তখন নবতারা কপাল চাপড়ে কাঁদতে শুরু করেছে। পাশে বসে কাজল বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সে নিজের মনের দিক থেকেই জোর পেল না।

ডাক্তার একটু পরীক্ষা করেই সরে দাঁড়াল। কাজলের দিকে ফিরে বলল, আমার কিছু করবার নেই। হঠাৎ উঠতে গিয়ে অন্ধকারে পড়ে গিয়েছেন বুঝি?

কাজল নবতারার দিকে চোখ ফেরাল। কি হয়েছিল তা আর অজানা নয়। ঘরে ঢুকতেই বুঝতে পেরেছে। টেবিলের ওপর বাণী আর মণ্টুর খাবার ঢাকা ছিল, ভোরে উঠে খাবে। মাঝরাতে পরাশরবাবু সে দিকেই হাত বাড়িয়েছিলেন। কি ভাবে পা হড়কে পড়ে গিয়েছেন।

মুখোমুখি মৃত্যুর চেহারা দেখা কাজলের এই প্রথম। কোলের ওপর হাত দুটো রেখে বাপের মৃতদেহের কাছ ঘেঁসে বসে রইল। অর্ধ-অচেতন অবস্থা। কোথা থেকে লোক এল, খাটিয়া যোগাড় হল, ফুলের মালা আর তোড়া। পাড়ার ছেলেদের শোকধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে নবতারার গুমরে গুমরে কান্নার শব্দ শোনা গেল। কিন্তু আশ্চর্য, এক ফোঁটা জল নেই কাজলের চোখে। অনেক চেষ্টা করেও সে কাঁদতে পারল না। কাঁদতে পারল না বটে, কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা বুকের মাঝখানে। গলার মধ্যে পাক দিয়ে উঠল অব্যক্ত এক অনুভূতি।

কাজলের প্রথমে মনে হয়েছিল যে সংসার থেকে পরাশরবাবু সরে যাওয়ায় খুব আঘাত হয়তো সে পাবে না। বরং একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে, ভার লাঘবের শান্তি। কিন্তু বাপের ঘরের দিকে চোখ পড়লেই কাজলের দুটো চোখ ছল ছল করে ওঠে। একটা পঙ্গু পরনির্ভর লোক যে সংসারের এতখানি জুড়ে ছিল তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

নবতারা কিন্তু বেশ সামলে উঠল। দিন তিন চার অঝোর ধারায় কেঁদে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। সংসারের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিল। কাজলকে ডেকে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করল সহজ সরল ভাষায়। কাজলের ভবিষ্যৎ নয়, সংসারের। আলমারি খুলে নিজের শাড়িগুলো বাণীকে দিয়ে দিল, পরাশরবাবুর পুরোনো কোট আর সার্ট যত্ন করে গুছিয়ে রাখল। মণ্টু বড় হলে পরবে। এমন ভাব দেখাল যেন নিজের শাড়ির প্রান্ত থেকেই রঙটুকু মুছে গেছে, সংসারের আর কোথাও রঙ একটুও ফিকে হয়নি। কেবল সামান্য উৎকণ্ঠা দেখাল বাণীর বিয়ের সম্বন্ধে। পরাশরবাবু চুপচাপ শুয়ে থাকতেন, চলা ফেরা বিশেষ করতে পারতেন না বটে, তবু তো পুরুষ মানুষ। পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা সবই চালাতেন। এখন সংসারে পুরুষ বলতে মণ্টু।

কাজল হেসেছে, না মা, পুরুষ বলতে শুধু মন্টু নয়, আমিও আছি। পুরুষ যা করতে পারে, আমিও তাতে পিছপা নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

নবতারা সত্যি নিশ্চিন্ত হল। কাজল কোন কাজের ভার নিলে ভাবনার আর কিছু থাকে না। উঠতে উঠতে বলল, ভগবান বাঁচিয়েছেন কাজল। আজ তুই পরের ঘরে চলে গেলে আমাদের কি অবস্থা হত। ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হত।

একটা শক্ত উত্তর দিতে গিয়েও কাজল নিজেকে সামলে নিল। চোখ পড়ল মার থান কাপড়ের দিকে। সর্বহারা নিঃস্ব রূপ। এমন একজনের কাছ থেকে আঘাত হয়তো নেওয়া যায় বুক পেতে কিন্তু সে আঘাত ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু এমনি করে সবাই ভুল বুঝবে কাজলকে! সকলেরই ধারণা বিয়ে করে পর হয়ে যেত কাজল। নিজের আহরিত অর্থে পরিপাটি করে নিজের নীড়ই সাজাত শুধু, আর কারো দিকে ফিরে চাইত না। কাজলকে যেমন এরা চেনে না, তেমনি দিলীপকেও জানে না। এমন একটা খবরে দিলীপ আর কাজল বুক দিয়ে এসে পড়ত। এখন যেটুকু সাহায্য করছে, তার চেয়ে ঢের বেশী করতে পারত দুজনে। কাজল তো শুধু অর্থই দিতে পারে, দিলীপ দিতে পারত সামর্থ্য।

খবর পেয়ে একদিন প্রফেসর বসাক এসেছিলেন। সঙ্গে অরবিন্দ। কাজলকে কাছে ডেকে প্রফেসর বসাক বুঝিয়েছিলেন। সেই গীতার পুরোনো কথা। মৃত্যু যে বস্ত্র পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়, তারই বিশদ ব্যাখ্যা।

পর্দার ওপারে দাঁড়ান নবতারার দিকে চেয়েও আশ্বাস দিয়েছেন। কাজল রয়েছে, বুদ্ধিমতী মেয়ে। কোন দিক দিয়ে কারো কোন অসুবিধা হবে না।

অরবিন্দ সারাক্ষণ একটি কথাও বলেনি। চুপচাপ জানলার ধারে মাথা নিচু করে বসেছিল, শুধু যাবার সময়ে কাজলের

কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি বাপকে চোখে দেখিনি কাজলদি। বাপ গেলে কি ভাবে সান্ত্বনা দিতে হয়, তার ভাষা আমার জানা নেই। তবে আপনার বাবার শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে আপনার কাছে যেটুকু শুনেছি তাতে এভাবে দিনের পর দিন যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে সরে যাওয়াটা তাঁর নিজের দিক থেকে রোগ মুক্তিরই সামিল।

কাজল কোন উত্তর দেয়নি। দুজনকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে বসেছে, চিঠি লেখবার কাগজ সামনে নিয়ে।

চিঠি একটা লেখা দরকার দিলীপকে। বাবার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে। নিছক ভদ্রতা, আর কিছু নয়। মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে কাজল কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু ওই পর্যন্ত। কালির একটু আঁচড়ও পড়ল না কাগজে। কথাটা মনে হতেই কাজল সোজা হয়ে বসল। সরিয়ে রাখল হাতের কলম।

তাই যদি মনে করে বসে দিলীপ, তাহলে কাজলের লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। বাপ নেই মানে বাধার প্রাচীর অপসারিত। দিলীপের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পথে আর কোন অসুবিধা নেই। পঙ্গু বাপের উদ্ধত তর্জনীর ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। দিলীপের ব্যাকুল বাহুর বন্ধনে ধরা দেওয়া সম্ভব হয়নি, আজ তার দিক থেকে সামান্য বাধা নেই, নিষেধও নয়। প্রকারান্তরে কাজল সমর্পণ করছে নিজেকে, এ চিঠির প্রতি ছত্র তাইতো বোঝাবে। নিজেকে এত লঘু করবে কাজল, তাও দিলীপের কাছে!

কি করে দিলীপকে সে বোঝাবে বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরও দৃঢ় হয়েছে সংসারের শৃঙ্খল। এতদিন শুধু টাকা দিয়েই সে নিজের কর্তব্য শেষ করেছিল, এবার থেকে আরো গুরু দায়িত্ব নিতে হবে তাকে। বাণীর বিয়ে, মন্টুর লেখাপড়া, বিধবা মায়ের ভবিষ্যৎ সংস্থান সব কিছুর ভার তার ওপর। শুধু অর্থ দিয়েই এ সমস্যার

সমাধান হবে না, অর্থের সঙ্গে শক্তি, সামর্থ্য সব নিয়োজিত করতে হবে।

কাজল চিঠি লিখল না, কিন্তু চিঠি এল দিন দুয়েকের মধ্যে। অফিস থেকে ফিরতেই মণ্টু খবর দিল, তোমার একটা চিঠি এসেছে দিদি।

চিঠি! দু'একজন পুরোনো বান্ধবী মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। নিজেদের নতুন সংসারের বিবরণ কিংবা কাজলের সম্বন্ধে উদ্বেগ। বয়স যে বেশ হল, আর কবে সংসার পাতবে।

এ সব চিঠির অর্থ যে কাজল একেবারে বোঝে না এমন নয়। নিজেদের জীবন থেকে কিছুটা রঙ নিয়ে তারা ছড়িয়ে দেয় কাজলের দিকে। লেখাপড়ায় তারা হয়তো কাজলের সমকক্ষ হতে পারেনি, তার ধারে কাছে ঘেঁসতে পারেনি, কিন্তু সাজানো সংসারের গৃহিণী হয়ে বসেছে। সুখ আর সম্পদে ঘেরা জীবন।

খামের চিঠি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাজল খামটা ছিঁড়ল, চিঠিটার শেষ দিকে একবার চোখ বুলিয়েই আর দাঁড়াতে পারল না। বিছানার ওপর এসে বসল। ইতি দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিলীপ চিঠি লিখেছে, এত দিন পরে, এক পাতা চিঠি।

রুদ্ধ নিশ্বাসে কাজল চিঠিটা পড়ল। অরবিন্দের কাছে কাজলের পিতৃবিয়োগের খবর দিলীপ পেয়েছে। প্রথমে মামুলী সান্ত্বনা জানিয়েছে, তারপর উপদেশ। কঠিন এই সংসার। সামান্য ত্রুটি, সামান্য ভুলেরও ক্ষমা নেই। দ্বিগুণ আঘাত পেতে হবে। সমস্ত জীবন চুরমার হয়ে যাবে। সমবেদনার প্রলেপ আসবে না কোন দিক থেকে। শেষদিকে শুধু এইটুকু জানিয়েছে, যদি দিলীপের কাছ থেকে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় বিনা দ্বিধায় যেন কাজল জানায় তাকে।

চিঠিটা কোলের ওপর রেখে কাজল চুপচাপ বসে রইল। অনেকক্ষণ। নিজের কথা দিলীপ কোথাও লেখেনি। কাজল আর দিলীপের কথাও নয়। এত নিস্পৃহ কেন হল দিলীপ, এত মমতাহীন! কি ক্ষতি হত বাড়তি এক ছত্রে শুধু জানাতে, ভাল

আছে দিলীপ কিংবা কাজের ফাঁকে ফাঁকে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে, এটুকু শুধু লিখতে।

শুতে যাবার আগে কাগজ কলম নিয়ে কাজল বসল। অনেক কাটাকুটির পর এক পাতা লিখল কোনরকমে। সংসারের খবর। মামুলী কথাবার্তা। শেষদিকে শুধু একটা লাইন। কলকাতায় কবে ফিরবে দিলীপ। ওখানকার কাজ কবে শেষ হবে।

সেদিন অফিসে গিয়েই কাজল খবরটা শুনল। প্রফেসর বসাক নিজের মুখেই বললেন। তাঁর দিল্লীতে বদলীর হুকুম এসেছে। উচ্চতর পদে নিয়োগের খবর। দিন তিনেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে।

কাজলের পিছনে অরবিন্দও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রফেসর বসাকের কথা শেষ হতেই বলল, তাহলে আমাদের কি হবে স্যর?

কি হবে? প্রফেসর বসাক হাসলেন।

আবার কে আসবেন এখানে? কি চোখে আমাদের দেখবেন। অরবিন্দ আমতা আমতা করল।

যেই আসুন, নিজের কাজ করে গেলে ভাল চোখেই দেখবেন। প্রফেসর বসাক খুব ধীর গলায় উত্তর দিলেন।

আসল কথাটা বললেন অরবিন্দ বেরিয়ে যেতে। কাজলকে সামনের চেয়ারে বসতে বলে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, বড় মুস্কিলের ব্যাপার কাজল।

কাজল কোন কথা বলল না। মুখ তুলে প্রফেসর বসাকের দিকে চাইল।

এ অফিস উঠিয়ে দেবার একটা কথাবার্তা হচ্ছে। কর্তাদের মত, যে ভাবে কাজ হবে বলে তাঁরা আশা করেছিলেন, সে রকম নাকি কিছু হচ্ছে না। অবশ্য গোড়াতেই তাঁরা ভুল করেছেন। যে কোন রিসার্চের কাজই সময়-সাপেক্ষ। এ কাজে বীচি পুঁতেই ফলের আশা করা যায় না। বোধ হয় মাস তিনেকের মধ্যেই সব কিছু গুটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হবে।

প্রফেসর বসাক একটু দম নিলেন। টেবিলের ওপর রাখা প্যাডের ওপর আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন, যে কাজে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে মাইনে হয় তো কিছু বেশী আর পদটাও গালভরা, কিন্তু তাতে রিসার্চের কোন সুযোগ নেই। একেবারে বাঁধা-ধরা রেকর্ড রক্ষা করার কাজ। এ কাজ আমিও কতদিন করব তার ঠিক নেই। তবে আমার বয়স হয়েছে, আর কতদিনই বা চাকরি করতে পারব। আমার কথা নয়, আমি ভাবছি তোমাদের কথা।

কিন্তু প্রফেসর বসাক সব কথা বলবার আগেই কাজলের মুখ রক্তহীন। মেঝের ওপর রাখা পা দুটো থরথরিয়ে কাঁপছে। চোখের সামনে অন্ধকারের তরল স্রোত। কি হবে তাহলে! কি করবে কাজল! মা, ভাই, লাউয়ের কচি ডগার মতন বেড়ে ওঠা এক বোন, কোথায় দাঁড়াবে এদের নিয়ে।

হাতের জমানো পুঁজি বাপের কাজেই প্রায় নিঃশেষ। যা সামান্য কিছু আছে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে বড় জোর মাস তিনেক চলতে পারে। তারপর?

প্রফেসর বসাকও সেই কথাই বললেন, অরবিন্দের জন্য ভাবছি না। তার চাকরি অনেকটা শখের। কিন্তু তোমার ঘাড়ে একটা গোটা সংসার।

এবারেও কাজল কোন উত্তর দিল না। উত্তর দেবার মতন তার কিই বা আছে তিল তিল করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে পায়ের তলার মাটি। চারদিকে অথই জল। কূল নেই কোথাও, কোন আশ্রয় নয়। নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর বুঝি কাজলের কোন উপায় নেই।

কাজল নিজের জায়গায় ফিরে আসতেই অরবিন্দ কথা বলল, কি ব্যাপার, প্রফেসর বসাক চলে যাবেন শুনেই যে আপনার মুখ চোখের চেহারা বদলে গেল?

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে কাজল ম্লান হাসল, নতুন আবার কে আসবেন, কেমন মানুষ হবেন তার ঠিক আছে।

নতুন আর কেউ আসবেন না। অরবিন্দ লিখতে লিখতেই উত্তর দিল। মাথা না তুলে।

তার মানে? কাজল বিস্মিত হল।

তার মানে, এবার অরবিন্দ হাসল, অফিসই থাকবেনা তা আবার নতুন লোক আসা।

অফিসই থাকবে না? কে বললে তোমাকে?

বলেনি কেউ, আমরা জানি।

জানো?

হ্যাঁ, জানি বইকি। শুধু আমি নয়, অফিসের পিওন গজেনও জানে। আর বড় জোর মাস তিনেক, তারপর সব ছাড়িয়ে দেবে। এত খরচ করে সরকার এখানকার অফিস রাখবে না।

বুঝতে পারল কাজল নিভৃতে তাঁকে ডেকে প্রফেসর বসাক যে কথাটা বলেছেন, সে কথাটা অফিসের সবাই জানে। অবশ্য এটা প্রফেসর বসাক জানতেন না, জানলে অরবিন্দকে সরিয়ে দিয়ে শুধু কাজলকেই বলতেন না কথাটা।

কিন্তু অফিসের সবাই কথাটা কি করে জানল?

কলম সরিয়ে রেখে অরবিন্দ সোজা হয়ে বসল। একটু গম্ভীর গলায় বলল, ঝড় আসবার আগে পাখিরা ঠিক টের পায়। পাখা গুটিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করে। অবশ্য সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছায় না, মাঝপথেই প্রাণ হারায়।

অরবিন্দ!

কাজলদি। কাজলের অশ্রুভেজা গলায় অরবিন্দ চমকে মুখ তুলল।

মাঝপথে যদি কেউ প্রাণ হারায় তো সে আমি।

এত অল্পেই নিজের ওপর বিশ্বাস হারান কাজলদি?

অরবিন্দের গলায় সান্ত্বনার সুর।

খুব অল্পে যে ভেঙে পড়ি না সেটুকু তো তুমি জান অরবিন্দ, কিন্তু পায়ের তলার মাটি সরে গেলে মানুষের পক্ষে দাঁড়ানই যে সমস্যা হয় ভাই।

তাও নয় কাজলদি। ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ আছে। পায়ের তলা থেকে মাটি নিশ্চিহ্ন, কিন্তু মানুষ বার বার নতুন জমিতে নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছে। উপসাগরের জলে হতাশায় প্রাণ বিসর্জন দেয়নি।

কাজল কোন উত্তর দিল না। এ জিনিস নিয়ে তর্ক চলে না, বিশেষ করে অরবিন্দের সঙ্গে। সংসারের আঁচ একটুও লাগেনি অরবিন্দের গায়ে, কাজলের মতন দিনের পর দিন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি।

কাজেই বাছা বাছা শব্দ চয়ন করে লাগসই কথার মালা গাঁথা তার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু তবু অরবিন্দর কথায় যেন সাহস পেল কাজল। অথৈ জলের পারে কালো অস্পষ্ট বিন্দু। হয়তো তটরেখা, হয়তো নয়, কিন্তু তবু একটা নিরাপত্তির আশ্বাস।

দিন পনেরোর মধ্যেই প্রফেসর বসাক বদলী হলেন, তারই মাসখানেকের মধ্যে বাদামী কাগজে চরম নোটিশ এসে হাজির। অফিস উঠে যাবে, তবে কর্তৃপক্ষ নিষ্করুণ নন। প্রত্যেকে পাবে তিন মাসের মাহিনা আর কর্মদক্ষতার সার্টিফিকেট।

কাজল ইতিমধ্যে দু'এক জায়গায় আবেদনপত্র ছেড়েছিল, বেশীর ভাগই মেয়েদের স্কুল কলেজে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন উত্তরও আসেনি কোথা থেকে। শহরে চেনাজানা এমন কেউ নেই কাজলের, যার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, অন্ততঃ উপদেশের আশায়।

·

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই কাজল অবাক। বাইরের ঘরে অরবিন্দ বসে।

কি ব্যাপার অরবিন্দ, অফিস যাওনি যে?

অরবিন্দ উঠে দাঁড়াল, যে খাঁচায় থাকব না, তার মায়া করে আর লাভ কি? একটা খবর আছে কাজলদি।

হাতব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে কাজল একটা চেয়ার টেনে

বসে পড়ল, বল, কি খবর? তারপর কি মনে হতেই কাজল উঠে দাঁড়াল, বলল, দাঁড়াও, এক কাপ চা বলে আসি।

শুধু চায়ে হবে না কাজলদি, একটা সুখবর আছে। বরং সেটা আগে শুনেই যান।

সুখবর? কাজল ফিরে দাঁড়াল, চেয়ারের হাতল ধরে বলল, বল, কি তোমার সুখবর? মোহনবাগান আরো দু'একটা কাপ পেল, না পোল্‌ভল্টে কেউ পৃথিবীর রেকর্ড ছুঁল?

অরবিন্দ হাসল, না, সে সব কিছু নয়, আপনার একটা চাকরি হয়েছে।

বল কি! কাজল আবার চেয়ারে বসল, তাহলে তো সত্যিই সুখবর। শুধু চায়ে তো তোমার সংবর্ধনা করা চলে না। কিন্তু চাকরিটা কিসের? কালি তৈরির কারখানায় নয় তো?

ন্যাশনাল কলেজে।

কিন্তু যোগাযোগটা হল কি করে? না দরখাস্ত, না কিছু।

আপনার কি ধারণা দরখাস্ত দিলে তবে চাকরি হয়? আগে নিয়োগপত্র আসে তারপর আবেদন দিতে হয়, আপনার কাছ থেকে সেই আবেদনপত্রই নিতে এসেছি।

কিন্তু অরবিন্দ, কি করে এটা সম্ভব হল ভাই?

আমার দাদা আছেন ওই কলেজে, দিলীপদার বন্ধু। দিলীপদাই লিখেছিলেন দাদাকে।

দিলীপদা! কাজলের গলা থেকে আচমকা একটা আওয়াজ বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য মানুষ, অত দূরে বসেও ঠিক ভাবতে শুরু করেছে, অফিস উঠে গেলে কার কতটুকু অসুবিধা হবে। শুধু ভাবাই নয়, খোঁজ করে চিঠিও দিয়েছে। বলা যায় না, এ শহরের চেনা জানা আরো অনেককে হয়তো দিয়েছে এমনিভাবে। কাজলকে নেবার জন্য সুপারিশ করেছে।

কি হল? অরবিন্দ সোজাসুজি চাইল কাজলের দিকে।

না, হয়নি কিছু। ভাবছি।

কি ভাবছেন তাও বলতে পারি।

কাজল আঁচড় ফেলল দুটো ভ্রূর মাঝখানে। প্রশ্ন করল, কি ভাবছি ?

ভাবছেন কৃতিত্বটা যখন দিলীপদার, তখন অন্য লোককে মিষ্টি খাওয়াতে যাই কেন।

এবার কাজল সহজভাবে হেসে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, না ভাই, সংবাদটা বহন করে যখন তুমি এনেছ তখন পুরস্কার তোমারই প্রাপ্য। একটু বস, এখনি আসছি।

পর্দা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই নবতারার সঙ্গে দেখা। বোধ হয় পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, কাজলকে দেখে সরে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁরে, অরবিন্দ চাকরির খোঁজ এনেছে বুঝি, কোথায় হল ?

কাজল গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, আড়াল থেকে সবই তো শুনেছ মা, আবার আমায় জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

নবতারা একটু থতমত খেয়ে গেল, তারপর বলল, না, না, তোদের কথাবার্তা কিছু শুনিনি, আমি কেবল ছেলেটিকে দেখছিলাম।

চলতে চলতে কাজল ফিরে দাঁড়াল। বলল, ছেলেটিকে দেখছিলে ?

হ্যাঁরে, দিব্যি ছেলে, বাণীর সঙ্গে বেশ মানায়।

কাজল থেমে গেল। বড় হয়ে গেছে বাণী, বাড়িতে ছেলে এলে তার পাশে দাঁড়াবার কথাও ভাবতে শুরু করেছে বাড়ির লোক। কাজলেরই বুঝি সেদিকে সাড় নেই। নিজের চিন্তাতেই বিভোর

ঝিকে দিয়ে খাবার আনতে পাঠিয়ে কাজল বাণীকে ডেকে আনল।

বাণী বোধ হয় রান্নাঘরে মাকে সাহায্য করছিল। আধময়লা কাপড়, দু'তিন জায়গায় হলুদের ছাপ। রুক্ষ চুলের রাশ নিয়ে দিদির সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ নিচু করে।

একি চেহারা করেছিস ! বিকেলে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতেও পারিস না ?

বাণী প্রমাদ গুণল। এমনিতে পারদপক্ষে কাজলের সামনে আসে না। স্কুল শেষ করে রান্নাঘরে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। মাকে সরিয়ে দিয়ে টুকিটাকি রান্না করে। মাঝে মাঝে মণ্টুকে পড়াতে বসে। শুধু খাবার সময়ে দিদির সঙ্গে দেখা হয়। তাও রোজ নয়।

যা, মুখ হাত ধুয়ে আয় ভাল করে। তাড়াতাড়ি একটা ফর্সা কাপড় বের করে পর। বয়স হচ্ছে, কি ভুত সেজে থাকিস বলত ?

বাণীর অবস্থা কাহিল। একটুও দেরী না করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

সেজেগুজে যখন বেরল তখন কাজল ট্রেতে চা আর খাবার সাজিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

বাইরে অরবিন্দ বসে আছে, এটা তাকে দিয়ে আসতে হবে। সাবধানে ট্রেটা তুলে ধরে কাজল বাণীর দিকে এগিয়ে দিল।

আমি ? বাণী ছুটো চোখ বিস্ফারিত করল, রামের মা নেই ?

আছে, কিন্তু তুমি নিয়ে গেলে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হবে না। এস।

কাজল যখন বাইরে গিয়ে দাঁড়াল তখন অরবিন্দ চেয়ারে নেই, জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এস অরবিন্দ, আমার একটু দেরী হয়ে গেল ভাই। বুঝতেই তো পারছো, বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই।

সে কি, মণ্টুবাবুকে তো পুরুষ বলেই জানতাম।

তা ঠিক জানতে, কিন্তু তিনি হকি খেলায় ব্যস্ত। কথার সঙ্গে সঙ্গেই কাজল হাত দিয়ে সুইচটা টেনে দিল।

অরবিন্দ ঘুরে দাঁড়াতেই বাণীর অবস্থা কহিল। হাত কেঁপে চা চলকে আঙুলের ওপর পড়ল। সারা মুখ রক্তহীন। টেবিলের ওপর ট্রেটা কোনরকমে রেখে বাণী কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়াল।

বাণীকে তো তুমি এর আগে দেখেছ অরবিন্দ ?

হ্যাঁ দেখেছি বোধ হয়। এর আগে একবার দেখেছি। আপনাদের বিপদের সময়।

কাজল ভাল করে বাণীকে দেখল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এ বাণীকে কাজলও বোধ হয় দেখেনি। সেদিনের ফ্রক পরা আধঘুমন্ত মেয়েটা পত্রপুষ্পে এমন সতেজ হয়ে উঠেছে এই অল্প সময়ের মধ্যে, ভাবতেও কাজলের আশ্চর্য লাগল। সুগৌর বর্ণ হয়তো নয়, কিন্তু মাজা রঙে, টিকালো নাক আর টানা চোখে খুবই সুশ্রী দেখাচ্ছে বাণীকে। কিছুটা প্রসাধনের জন্য, কিছুটা লজ্জায়, সারা মুখে অপরূপ স্নিগ্ধতা।

অপ্রস্তুত ভাবটা অরবিন্দ কাটিয়ে উঠল। বাণীকে ডেকে বসাল সামনের চেয়ারে। হাসতে হাসতে বলল, খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করছ তো ? দিদির মতন হতে হবে কিন্তু। বছর বছর প্রাইজের গাদা বয়ে নিয়ে আসতে হবে।

বাণী মাথা নিচু করল, কিন্তু উত্তর দিল কাজল, দিদির মতন আর কাউকে হয়ে দরকার নেই ভাই। ম্যাট্রিকটা পাশ করলে কোনরকমে একটা পাত্র জুটিয়ে বাণীর বিয়েটা দিতে পারলে বাঁচি।

ছু হাতে ট্রেটা চেপে ধরে অরবিন্দ টাল সামলাল। বাণীর ধাক্কায় আর একটু হলেই সব ওল্টাত। তীরবেগে বাণী ছুটে ভিতরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে হাসল ছু'জনে। কাজল আর অরবিন্দ।

হাসি থামিয়ে কাজল বলল, নতুন চাকরির খবর এবার বল। কবে থেকে জোয়াল কাঁধে নিতে হবে ?

যেদিন থেকে আপনার খুশি। আমার তো মনে হয় সামনের মাস থেকেই ভাল, কারণ এ অফিসের. চাকরি এখনও তো এ ক'টা দিন রয়েছে।

কি কাজ আমার ? কোন্ কোন্ ক্লাশ নিতে হবে ?

অতশত জানি না। আমার ওপর হুকুম হয়েছে আপনাকে

খবরটা জানাতে। আপনি বরং আবেদনপত্র নিয়ে কালই একেবার গিয়ে দেখা করবেন। আজ উঠি কাজলদি।

অরবিন্দ ওঠার মুখে কাজলের কথাটা মনে পড়ল, দিদির তো চাকরির ব্যবস্থা করলে, নিজে কি করবে ?

নিজে, অরবিন্দ মাথা চুলকাল, এখন কিছু ভেবে উঠতে পারি নি। চাকরি আর আমায় কে দেবে। ভাবছি পড়াশোনা আরম্ভ করব আবার।

পড়াশোনা ?

হ্যাঁ, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে বইপত্র ঘাঁটব।

তার মানে রিসার্চ করবে ?

রিসার্চ করব আমি ! ক্ষেপেছেন। যতদিন বই-পত্র আড়াল দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারি।

অরবিন্দের কথায় কাজল একটু আনমনা হয়ে গেল। রিসার্চের কথায় আর একজনের কথা মনে পড়ে গেল। লোকালয় ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, সুখ সুবিধা ছেড়ে যে লোকটা বনে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাথরের মূর্তির সন্ধানে। হারিয়ে যাওয়া যুগের সংস্কৃতির মুক্তো কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

শুতে যাবার আগে কাজল কাগজ সামনে নিয়ে বসল। ধন্যবাদ জানিয়ে দিলীপকে একটা চিঠি লেখা দরকার। অত দূরে বসেও কাজলের জন্য ভাবছে, তদ্বির তদারক করছে তার জন্য। কিন্তু লিখতে গিয়েই কাজলের মনে পড়ে গেল। অফিস উঠে যাওয়া মানে দিলীপেরও তো চাকরি যাওয়া। ওখানে থাকবার দিলীপের হয়তো আর কিছু দরকারই হবে না। শহরে চলে আসবে, এতদিনে হয়তো রওনাও হয়েছে। চিঠি থাক, মুখোমুখি দাঁড়িয়েই কাজল ধন্যবাদ জানাবে, জানাবে অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

অফিসে গিয়েই কাজল সঠিক খবর পেল। অরবিন্দের কাছে।

দিলীপেরও চাকরি শেষ, কিন্তু দিলীপ এখানে ফিরবে না। ওখানেই কাটাবে বাকি জীবন। রাজস্থানের দুর্গম পল্লীপ্রান্তে আদিবাসিদের সঙ্গে বাস করবে। পাহাড়ের বুকে, অরণ্যের গভীরে ছড়ান হাজার হাজার ভগ্নমূর্তি, শিলাফলকে উৎকীর্ণ চারণ গানের কলি, এই সব সংগ্রহ করবে। এক সময়ে গ্রন্থ রচনা করবে এই সব উপজীব্য করে। নতুন দৃষ্টিতে নতুন রূপায়ণে অতীত ইতিহাসকে জগতের সামনে মেলে ধরবে।

চুপ করে কাজল কথাগুলো শুনল। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে রইল সারাক্ষণ। অরবিন্দর দিকে চাইতে সাহস হল না। কি জানি যদি বুকের দাপাদাপির চিহ্ন মুখে ফুটে ওঠে! মনের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করে কাজল ক্লান্ত, কিন্তু ক্লান্তির ছাপ বাইরের লোকে জানতে পারলে কাজলের লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না।

হাজার হাজার পাথরের মূর্তির সঙ্গে জীবনের গ্রন্থি বন্ধন করেছে দিলীপ তাই এদিকে আসার তার অবসর নেই। এমনও তো হতে পারে রক্তমাংসের সজীব একটা মূর্তিকে এড়াবার জন্যই দিলীপ আত্মগোপন করে আছে। কাজলকে ভোলার জন্যই তার এই নীরব সাধনা, নিভৃত কৃচ্ছ্রসাধন।

নামেই কলেজ। না আছে শ্রী, না ছাঁদ। কয়েকজন শিক্ষাবিদ মিলে শিক্ষায়তন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে শুধু। অভাব আর অনটনের দমকা হাওয়ায় যে কোন মুহূর্তে আদর্শবাদের এই সৌধ ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়তে পারে। তবে চিরদিন এমন যাবে না। অক্লান্ত শ্রম আর অফুরন্ত অধ্যবসায় দিয়ে এ শিক্ষায়তনটিকে সুদৃঢ় করে তুলবে সবাই! শিক্ষক আর ছাত্রের মিলিত ঘামে পাকা হবে এর বনিয়াদ। দিগন্তের সেই স্বপ্নের দিকে চেয়েই সকলে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রথমদিন প্রৌঢ় অধ্যক্ষ এই কথাই কাজলকে বোঝালেন। তিনি অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক। প্রাক্তন ছাত্রদের টানে আবার নতুন করে নেমেছেন অধ্যাপনার কাজে।

শুধু অধ্যাপনার দাঁড়ে ভর দিলে সংসার তরণী টলমল করবে, হয়তো শেষ রক্ষা হবে না, তাই কাজল বাড়তি অবলম্বন হিসাবে বাড়তি দুটি টিউশনি জোটাল। একটা সকালে আর একটা বিকালে। ফলে ভোর থাকতেই কাজলকে বেরিয়ে পড়তে হয়। নটা নাগাদ ফিরেই কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে কলেজ। ফিরতে রাত প্রায় আটটা। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ, কিন্তু পুরো রসদ তাকেই যোগাতে হয়।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে একটা চিঠি লিখবে দিলীপকে। সংসারের হাজার ঝামেলা চুকিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসেওছে অনেকদিন, কিন্তু সাদা কাগজে একরাশ আঁকি বুঁকি কেটে উঠে পড়েছে। কি লিখবে কাজল। কতটুকু লিখবে। শুধু সাদা কাগজে কতকগুলো কালির আঁচড় কেটে কতটুকু আর বোঝান যাবে। চিঠি নয়, হৃদয় যদি মেলে ধরতে পারে দিলীপের সামনে, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়, তাহলে বোধ হয় মনের কথা দিলীপ কিছুটা বুঝতে পারবে।

অভিমান করে দিলীপ সরে গেছে। কোনদিনই হয়তো আর এসে দাঁড়াবে না কাজলের সামনে। তা যদি আসত তাহলে সংসারের নাগপাশে কি ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে কাজল, কি ভাবে নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সাধ, আহ্লাদ সব জলাঞ্জলি দিয়েছে, সবই দেখতে পারত নিজের চোখে।

বিকেল থেকেই সেদিন মাথাটা টিপ টিপ করছিল। কোন রকমে ক্লাস দুটো সেরে কাজল সোজা বাড়িতে ফিরে এল। কলেজ থেকেই ছাত্রীর বাড়িতে ফোন করে দিয়েছিল। সিঁড়িতে উঠতেই মন্টুর সঙ্গে দেখা। হকি স্টীক হাতে হন হন করে নামছে। কাজলকে দেখে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল, তোমার একটা পার্শেল এসেছে দিদি।

পার্শেল ?

হ্যাঁ, পোস্টম্যান কিছুতেই দিতে চায় না। অনেক বুঝিয়ে তবে সই করে নিয়েছে মেজদি।

মণ্টু আর এক ধাপ নামতেই কাজল তাকে ডাকল, একটা কাজ করতে পারবি মণ্টু?

মণ্টু ফিরে দাঁড়াল।

মোড়ের দোকান থেকে তুটো অ্যাসপিরিনের বড়ি কিনে আনতে পারবি, কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজল হাত-ব্যাগ খুলে পয়সা বের করে মণ্টুর হাতে দিল, মাথাটা বড্ড ধরেছে।

মাথা ধরার আর দোষ কি। কলেজের পরেও আবার ছাত্রী পড়াবার এক ফ্যাঁসাদ জুটিয়েছ। এই সময়টা খোলা মাঠে একটু হাওয়া খাওয়া উচিত। আমাদের স্বাস্থ্য-মঞ্জরীতে বিশুদ্ধ বায়ুর উপকারিতার কথা লেখা আছে।

আছে বুঝি, দিসতো একবার পড়ে দেখবো? কাজল ওপরে উঠে এল।

টেবিলের ওপর চৌকো একটা পার্শেল। কাজল হাতে তুলে নিল। একবার চোখ বুলিয়েই প্যাকেটটা কোলের ওপর রাখল। বারবার পড়ল। দিলীপ পাঠিয়েছে। সুদূর রাজপুতানার পল্লী প্রান্ত থেকে।

কাগজের মোড়ক খুলতেই বইটা বের হল। সবুজ মলাট। ঝকঝকে তকতকে ছাপা। "রাজপুতানার মূর্তি বৈচিত্র্য।" গ্রন্থকার দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মলাটটা খুলতেই নতুন এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল কাজলের জন্য। সুন্দর হস্তাক্ষরে কাজলের নাম লেখা। প্রীতির চিহ্ন হিসাবে গ্রন্থকার পাঠাচ্ছে এই গ্রন্থটি। এ হাতের লেখা অচেনা নয় কাজলের।

এদিক ওদিক চেয়ে কাজল বইটা বুকের মধ্যে চেপে ধরল। অবাধ্য চোখ, তপ্ত তু ফোঁটা জল বইয়ের মলাটের ওপর পড়তেই কাজল চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘসে ঘসে

জলের ফোঁটা তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। দু জায়গায় অস্পষ্ট হয়ে গেল ঘোর সবুজ রং। অনেক চেষ্টা করেও আগের গাঢ় রং কাজল ফিরিয়ে আনতে পারল না।

কাজল! নবতারা দরজার ওপার থেকে নাম ধরে ডাকল।

কি মা?

নবতারা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল, কোথা থেকে কিসের পার্শ্বেল এল রে?

কাজল মার হাতে বইটা তুলে দিল।

এই বইটা এল? নবতারা অবাক চোখ মেয়ের দিকে ফেরাল। খরচপত্র করে কেউ যে বই পাঠাতে পারে কাউকে, এ তার ধারণারও বাইরে।

হ্যাঁ, দিলীপবাবু পাঠিয়েছেন, তাঁর নিজের লেখা বই।

দিলীপবাবু! আবছা নবতারার মনে পড়ল। কাজলের ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক হবার কথা ছিল এরই সঙ্গে। সে বিয়ে হলে সংসারের যে কি অবস্থা হত, ভাবতেও নবতারার ভয় করে।

কি করছেন দিলীপবাবু আজকাল? নবতারা মেয়ের আরো কাছে এসে দাঁড়াল।

রাজপুতানায় রয়েছেন। সেখানকার মূর্তি নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

পড়াশোনা? নবতারা হতাশ হল, কিন্তু ওর সংসার?

কাজল হেসে বলল, সকলের সংসারের অবস্থা আমাদের মতন নয় মা। উনি একলা। সরকার থেকে একটা বৃত্তিও পান, তা ছাড়া পৈত্রিক জমানো টাকাকড়িও আছে। আমাদের মতন মাসকাবারের আশায় তীর্থের কাকের মতন চেয়ে থাকতে হয় না।

নবতারা আড়চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। সংসারের জোয়াল কাজল নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সত্যি কথা। উদয়াস্ত খাটছে তাও সত্যি। কিন্তু তা বলে এমন ভাবে বাঁকা বাঁকা কথা বলবে দিনরাত! সংসারের খোঁটা দেবে এমনি করে! কাজল

কি পরের সংসারের ভার নিয়েছে। নিজের মা, ভাই, বোন এদের ওপর নিছক কর্তব্য ছাড়াও হৃদয়ের কোন সম্পর্কই বুঝি নেই। তা নয়, নিজে জীবনে ঘর বাঁধতে পারে নি, সুখী হয় নি, সেই আক্রোশেই বারবার নবতারাকে ছোবল দেয়। বিষ ঢালার চেষ্টা করে।

আঁচলে চোখ চেপে নবতারা সরে গেল কাজলের কাছ থেকে।

কাজল বইটা পড়ল না। অনেকদিন ধরে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘুরল। ট্রামে, বাসে, রাত্রে শোয়ার সময় মাথার বালিশের নিচে। দিলীপের সঙ্গে কটা দিনই বা থাকতে পেরেছে, তবু সেই কটা দিনের কথাই বিশেষ করে মনে পড়ল। কিছু বলা যায় না, আজ কাজলের স্বপ্ন সফল হলে হয়তো এই বইয়ের গ্রন্থকার হিসাবে দিলীপের নামের নিচে তার নামও থাকত। কি আর কাজল জানে, দিলীপের তুলনায় কতটুকু, তবু প্রাণ দিয়ে সে দিলীপের কাজের সাহায্য করত। নতুন কোন মূর্তি পেলে তুজনে তু পাশে বসে বিশ্লেষণ আরম্ভ করত। কখনো বা মতে মিলত, কখনও আপত্তি জানাত কাজল। মূর্তির বিশেষ ভঙ্গীমার ওপর জোর দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করত ভারতের বাইরের শিল্প পদ্ধতির কতখানি প্রভাব এই মূর্তির ওপর পড়েছে। কবে কোথায় অনেকটা এই ধরণের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, পুঁথি তন্ন তন্ন করে কাজল তার হদিশ বের করত। তারপর এক সময় দিলীপের কাছে হার মেনে তারই কোলে মুখ লুকোত। বলত, আমি কিচ্ছু জানি না গো। তার চেয়ে তুমি বল আমি শুনি।

এমন একটা জীবন কাজলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে এই সংসার। এক রাশ বুভুক্ষু আর এক তাল সামাজিক শাসন-অনুশাসন

সেদিন কলেজে যেতেই অধ্যক্ষের ঘরে ডাক পড়ল। মেঘ-থমথম মুখ অধ্যক্ষের। তারই ছায়া পড়েছে পাশে দাঁড়ান অধ্যাপক আর অধ্যাপিকাদের মুখে।

কাজল ঢুকতেই অধ্যক্ষ মুখ তুললেন, কলেজের বড় বিপদ !

কাজল শক্ত হাতে চেয়ারের হাতল ধরে টাল সামলাল।

ছাত্রছাত্রী ক্রমেই কমে আসছে। অধ্যাপকরাও একটু বেশী মাইনে পেলেই অন্য কোথাও চলে যাচ্ছেন। অবশ্য তাঁদের দোষও দেওয়া যায় না। জীবন সংগ্রামে বাঁচতে হলে এ ছাড়া আর উপায়ও নেই। সরকারী সাহায্যের জন্য অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সাড়াই পাওয়া যায় নি। অর্থের অভাবে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর কোন জিনিসই প্রায় আমরা কিনে উঠতে পারিনি, ফলে সায়েন্সের ছাত্রও আমরা হারাচ্ছি।

দুটো হাত টেবিলের ওপর রেখে অধ্যক্ষ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

মুহূর্তের মধ্যে কাজল হিসাব করে নিল। এ চাকরি যাওয়া মানে প্রায় পথে দাঁড়ান। ভাগ্য বিরাট থাবা মেলে কাজলকে তাড়া করেছে। এক তিল তাকে শান্তিতে বিশ্রাম করতে দেবে না। মনের শান্তি তো বহুদিনই নিশ্চিহ্ন। জীর্ণ একটা কাঠামো সম্বল করে কাজল দিনের পর দিন খেটে চলেছে। রক্ত আর ঘামের বিনিময়ে আহরিত অর্থ সংসারের পায়ে ঢালছে। কিন্তু এত বছর পরেও পায়ের তলায় মাটি পেল না। তটের কাছাকাছি যাবার আগেই প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় আবার তাকে আছড়ে ফেলছে মাঝ সমুদ্রে।

কাজলের কানে এল অধ্যক্ষের গলার আওয়াজ।

আপনারাই আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন। সেবার আদর্শ, শিক্ষার আদর্শ এই সব সামনে রেখেই এই শিক্ষায়তন আপনারা গড়বার চেষ্টা করেছেন। সে আদর্শ যদি আপনাদের আজও লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে সেখানে অর্থের প্রশ্ন প্রধান হওয়া উচিত নয়। আমার মনে হয় এ বিষয়ে যদি আপনারা সকলে কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করেন তাহলে কয়েকটা বছর আবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমার মনে হয়, দেশে শিক্ষার প্রসার বাড়ছে, সরকারও এ বিষয়ে বেশীদিন উদাসীন থাকতে পারবে না। ভবিষ্যৎ

আমাদের খুব অন্ধকার হয়তো নয়। যা হোক আপনারা বিবেচনা করে আমাকে জানাবেন। কমিটির কাছে কাল আমাকে আপনাদের বক্তব্য পেশ করতে হবে।

সকলে কমনরুমে ফিরে এল। বিবেচনা আর কি, যতদিন না ভাল কিছু জোটে, এই মাইনেতেই থাকতে হবে। কিন্তু স্বার্থত্যাগের মাত্রাটা কতখানি জানতে পারলে ভাল হত। অর্ধাশন তো চলেইছে, অনশনের রাহু জীবনকে গ্রাস করবে এবার।

অরবিন্দর দাদা মনোজবাবু কাজলকে ডাকলেন। রাশভারি লোক। বয়সের তুলনায় অনেক গম্ভীর। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাজলের সঙ্গে কথাই বলেন না।

আপনার কাছে আমরা লজ্জিত। অসুবিধা অনেকেরই হবে কিন্তু আপনার হবে সবচেয়ে বেশী।

কাজল কোন উত্তর দিল না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, শুধু আমার কথাই ভাবছেন কেন মনোজবাবু? আরো হয়তো অনেকে আছেন যাঁদের কষ্ট অনেক বেশীই হবে। সত্যি বলতে কি, দু'একজন যাঁরা শখের জন্য চাকরি করছেন তাঁরা ছাড়া এ বাজারে মাইনে কমে যাওয়া যে কতখানি তা আপনি বুঝতে পারবেন না।

কথাটা বলেই কাজল অপ্রস্তুত হল। এমন একটা কথা বলা মানে সোজাসুজি আঘাত করা মনোজবাবুকে। শখের জন্য, গালভরা আদর্শের বাণী আউড়ে যাঁরা এই শিক্ষায়তন গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে এসেছেন। বাড়ির কোন চিন্তা নেই, মাসান্তে ক্ষুধাকাতর মুখের কথা ভাবতে হয় না, দারিদ্র্যের করাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কোন সংসারের কথা নয়, ছোট ভাই বোনেদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার দায়িত্বও হয়তো নেই।

মাথার ঠিক নেই কাজলের। একটার পর একটা আঘাতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সহ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু ভালো লাগে না, কাউকে নয়।

মনোজবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর মৃত্বু গলায় বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, এ বাজারে মাইনে কমে যাওয়া যে কতখানি তা যে একেবারেই বুঝতে পারছি না, এমন নয়। মাইনের কমতিটা ফাঁকা আদর্শের বাণীতে ভরাট করা যে যায় না, সেটুকু অস্বীকার করব না। কিন্তু অন্য সকলের একটা বড় সুযোগ আছে অন্য প্রদেশ কিংবা কলকাতার আশপাশের কলেজে সুবিধা হলে চলে যেতে পারবেন, কিন্তু আপনার তো তাতেও অসুবিধা রয়েছে। অবশ্য দিলীপ আর অরবিন্দর কাছে যেটুকু শুনেছি তার ওপর নির্ভর করেই এ সব কথা আপনাকে বলছি।

কাজল নিজেকে সামলে নিল। মৃত্বু হেসে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমায় কি করতে বলেন ?

ঝোঁকের মাথায় কিছু করবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ শিক্ষায়তন আমরা একদিন বড় করে তুলতে পারবই। এখানে আসার জন্য আপনাকে আপসোস করতে হবে না। সাময়িক কিছু কষ্ট হবে এই যা। সেটা কাটিয়ে উঠতেই হবে আমাদের। কথা শেষ করে মনোজবাবু আর দাঁড়ালেন না। করিডর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এত দুঃখেও কাজলের হাসি পেল। হায়রে, এরা ভেবেছে ঝোঁকের মাথায়, উত্তেজনার বশে কাজল চাকরিই ছেড়ে দেবে। এরা তো জানে না, ত্ব'পায়ে কি শিকলের ভার বয়ে সে বেড়াচ্ছে। তেজ, অভিমান, অপমান সব তাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। এ পৃথিবীতে ভারবাহী পশুর চেয়ে তার মর্যাদা উচ্চস্তরের নয়।

বাড়ি ফেরার মুখেই অরবিন্দের সঙ্গে দেখা। অরবিন্দ দেখতে পায় নি, হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল, কাজলই ডাকল।

কি ব্যাপার, দৌড়াচ্ছ যে ?

অরবিন্দ হাসল, আপনার কাছেই এসেছিলাম। এত রাতে বাড়ি ফেরেন ?

কাজল এগিয়ে এল। রাস্তার লোকের কান বাঁচিয়ে বলল,

এরপর হয়তো সারা রাতেও আর বাড়ি ফিরতে পারব না। আরো গোটা দুয়েক টিউশনি নিতে হবে। তোমার দাদার কলেজে আমাদের সব মাইনে কমে যাচ্ছে, জান?

হ্যাঁ, জানি বইকি। মাথা নিচু করে অরবিন্দ জুতো দিয়ে পথের ওপর আঁচড় কাটল, তার ধাক্কা আমাকেও কিছু পেতে হয়েছে।

তোমাকে?

হ্যাঁ, দাদা নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন। একমাসের মধ্যে চাকরি-বাকরি একটা যোগাড় করে নিতে হবে। আর এ রকম ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো চলবে না।

তোমার অপরাধ?

অপরাধ কিছু নয়। আমাদের গোটা তিনেক বাড়ির ভাড়া থেকেই তো সংসার চলছিল। সামনের মাস থেকে সেই টাকার কিছুটা অংশ কলেজে ঢালবেন দাদা। তাতেও সুরাহা না হলে বৌদির গায়ের গহনা ইতিমধ্যেই দাদার কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি পায়ের ওপর পা তুলে রিসার্চের নাম করে ঘুরে ঘুরে বেড়াব তা কখনও হয়?

অরবিন্দের মুখের হাসি অম্লান। কাজল কিন্তু অবাক হয়ে গেল। কলেজের জন্য এ ভাবে নিজের সর্বস্ব মনোজবাবু দিচ্ছেন, অরে সেই লোককে কাজল কড়া কথা শুনিয়ে এল!

ছি ছি, লজ্জা হল কাজলের। নিজের দুঃখ আর নিজের নৈরাশ্যটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এত বড় করে ফেলেছে কাজল, যে পৃথিবীর আর সকলের দিকটা তার চোখেও ঠেকে না।

কাজল অন্য কথা পাড়ল, কই কি জন্য আমার কাছে এসেছিলে তাতো বললে না?

দিলীপদা আসছেন।

অরবিন্দর কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। চোখের সামনে তরল অন্ধকারের স্রোত। অনেক

কষ্টে টাল সামলাল। আশ্চর্য, শুধু একটা মানুষের নামে শিরায় শিরায় এমনি চাঞ্চল্য জাগে, এমনি উত্তাপ মুখে চোখে।

দিলীপবাবু আসছেন? আস্তে আস্তে কাজল কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

হ্যাঁ, সাংস্কৃতিক সম্মেলন থেকে ওঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এখানে "তাম্রলিপ্ত-যুগ" সম্বন্ধে সাতটা লেক্‌চার দিতে হবে।

কবে আসছেন? খুব স্তিমিত গলা কাজলের। এ সব কথা যেন বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে, আবার অবিশ্বাস করতেও ইচ্ছা হয় না।

আসতে কি চান। চিঠির পর চিঠি দিয়ে বহু কষ্টে রাজী করানো হয়েছে। তাও বোধ হয় সব শুদ্ধ বড় জোর দিন দশেক থাকবেন। এই সময় বেশীদিন বাইরে থাকলে ওঁর কাজের ক্ষতি হবে।

এতক্ষণ পরে কাজলের খেয়াল হল। এভাবে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা না বলে তার উচিত ছিল অরবিন্দকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়া।

চল অরবিন্দ, বাড়িতে বসে তোমার কথা শুনব।

আজ আর নয় দিদি, অনেক রাত হয়ে গেছে। পরশু দিলীপদা আসছেন, আপনি বরং কলেজ থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন, দুজনে এক সঙ্গে স্টেশনে যাব। গাড়ি পৌঁছবার কথা সাড়ে পাঁচটায়।

চলতি একটা বাস থামিয়ে অরবিন্দ উঠে পড়ল।

অরবিন্দ চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কাজল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সম্বিত হল পথচারী দু'একজনের কৌতুহলী দৃষ্টিতে। আস্তে আস্তে মাটি মাড়িয়ে কাজল বাড়ির দিকে রওনা হল।

মনে হল যেন এক যুগ আগে দিলীপের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তখন সংসারের ভার কিছুটা ছিল কাজলের ঘাড়ে। কিন্তু সে ভার এমন জগদ্দল পাথরের বোঝা হয়ে ওঠেনি। দিগন্তে তার স্বপ্ন ছিল, দিলীপের স্পর্শে নতুন জীবনের আভাস, কিন্তু আজ

আর কাজলের মধ্যে তার সামান্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজ কাজল মৃত,—দেহে আর মনে। কোন সঞ্জীবনী মন্ত্রেই বুঝি জীবনের এ জড়তা কাটবে না।

নিজের ঘরে পা দিয়েই কাজল সোজা টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সামনের বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখল, কাগজপত্র ওল্টাল, তারপর নবতারার দিকে চেয়ে বলল, আমার কোন চিঠি আসেনি মা ?

মেয়ের পিছন পিছন নবতারাও চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছিল। চিঠি ? কি জানি, আমি বাপু চিঠিপত্রের খোঁজ খবর রাখি না। বাণী কিংবা মণ্টুকে জিজ্ঞাসা কর। তারপর একটু থেমে প্রায় নিজের মনেই বিড় বিড় করে বলল, চিঠি দিয়ে আর কে খোঁজ করবে। সে রকম লোক কে আমাদের আছে বল ?

তা সত্যি, তিনকূলে কেউ নেই। থাকলেও এমন অবস্থায় উপযাচক হয়ে খোঁজখবর নেবার মত বোকামী কেউ করবে না। কিন্তু সে রকম কেউ নয়। অন্য একটি লোক। এত বছর পরে এ শহরে আসছে, তারই আসার খবরটুকু দেওয়া ছোট্ট একটা চিঠির খোঁজ করছে কাজল।

সামান্য তুটি ছত্র, কিন্তু তাই যে কাজলের কাছে অনেক।

বাণী আর মণ্টুকে জিজ্ঞাসা করেও কাজল চিঠির কোন সন্ধান পেল না। অবশ্য চিঠি যে একটা আসবেই এমন ধারণাই বা ওর হল কি করে! চিঠিপত্রে চিরদিন যোগাযোগ রেখেছে এমন তো নয়। এই যে বিদেশে বিভুঁয়ে একটা মানুষ পড়ে রয়েছে, কোন-দিন কাজল কি তার সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিয়েছে। মানুষটার শরীর গতিকের খবর! শুধু নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে ছাড়া কাজল কি কোন দিন তাকে চিঠি লিখেছে!

কাজল বাড়ি ফিরে দেখল অরবিন্দ আগেই এসেছে। বসে বসে মণ্টুকে ফুটবল-বিজয়-কাহিনী শোনাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে বাণী। নবতারাও কাছাকাছি রয়েছে।

তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পাল্টে নিন। হাতে বেশী সময় নেই, এইবেলা আমাদের রওনা হতে হবে।

কাজল নিজের শাড়ি ব্লাউজের দিকে চোখ ফেরাল। সাদা শাড়ি, পুরো সাতদিন ব্যবহারে বেশ একটু ময়লাই হয়ে গেছে। ব্লাউজের অবস্থাও প্রায় তাই। তবু সে মুখে বলল, কেন, কাপড় জামা তো ঠিকই আছে। এতেই চলে যাবে, কি বল ?

অরবিন্দ কোন উত্তর দিল না। তার উত্তর দেবার সময়ও নেই। বল গোলের কাছে। দুর্ধর্ষ গোলকিপার সান্নু দত্ত কি ভাবে গোরা সৈন্যর সবুট আক্রমণ থেকে যুগপৎ নিজের গোল আর দলের সম্মান বাঁচাল, তারই বর্ণনা চলেছে। উত্তেজনায় মণ্টু প্রায় অরবিন্দর গা ঘেঁষে বসেছে।

কাজল ঠিক করেছিল শুধু মুখ হাত ধুয়ে নেবে কিন্তু বাথরুমে ঢুকে স্নানই সেরে ফেলল। বিশ্রী গরম পড়েছে! ঘামে জব জব করছে শরীর। নিজের ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে শাড়ি বের করে নিল, সেই সঙ্গে জামাও।

সাজ পোশাক শেষ করে যখন কাজল বাইরে এল তখন অরবিন্দ সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে।

কাজলকে দেখে মুচকি হাসল, লেখাপড়া শিখুক আর মাস্টারিই করুক, মেয়ে কিন্তু মেয়ে।

অরবিন্দর পাশাপাশি গিয়ে কাজল ভ্রূ কোঁচকাল, তোমার এই আবিষ্কারের হেতু ?

না কিছু নয়, চলুন। অরবিন্দ সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

চলতে চলতেই কাজল বলল। অনেকটা কৈফিয়তের সুরে, ভাবলাম অনেক লোক হয় তো আসবে স্টেশনে, এত ময়লা শাড়ি পরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। একে তো এই চেহারা, তারপর জামাকাপড়ও যদি চেহারার সঙ্গে তাল দিয়ে চলে তা হলে মানুষেরা আঁতকে উঠবে।

কথাটা বলেই কাজল মনে মনে লজ্জা পেল। ছেলে মানুষ নয়

অরবিন্দ। কাজল আর দিলীপের পুরানো ইতিহাস যে না জানে এমনও নয়। যাতে মানুষ আঁতকে না ওঠে সেইভাবে সেজে আসার কি প্রয়োজন তাও বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়।

অরবিন্দ কিন্তু উত্তরের ধার দিয়েও গেল না। চলন্ত একটা ট্যাক্সিকে হাত নেড়ে থামিয়ে কাজলের দিকে চেয়ে বলল, আস্থন।

ট্যাক্সিতে উঠে কাজল অনুযোগ করল, ট্যাক্সির কি দরকার ছিল অরবিন্দ! ট্রামে বাসে তো অনায়াসেই যাওয়া চলত।

তা অবশ্য চলত। ট্রামে-বাসে গেলে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখতাম দিল্লীর গাড়ির সমস্ত প্যাসেঞ্জার বাড়ি পৌঁছে গেছে। সেই জায়গায় মাদ্রাজ মেইল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে।

আমিই তাহলে দেরি করিয়ে দিলাম অরবিন্দ:

অরবিন্দ কাজলের দিকে ফিরে চাইল, কি মুস্কিল, চাকরি-বাকরি নেই বলে এইভাবে কথার চিমটি কাটবেন? আমরা বুঝি সেই ধরণের মানুষ যারা দেরি না হয়ে গেলে ট্যাক্সিতে চড়ে না। কেন শখ থাকতে নেই আমাদের?

শখ?

হ্যাঁ, গরীবের ঘোড়া রোগ। কিন্তু দোহাই আপনার ট্যাক্সিতে বসে এভাবে খোঁচা দিলে ট্যাক্সি চড়ার সব আনন্দই নিভে যাবে। তা'ছাড়া আজ আমার অবস্থা একটু স্বচ্ছল! একটা খবরের কাগজ থেকে করকরে কুড়িটা টাকা পেয়ে গেছি।

বল কি, তাহলে তো বেশ স্বচ্ছল অবস্থা তোমার। কাজল মুখ টিপে হাসল।

আকবরী মোহর সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ লিখেছিলাম পরিবর্তে পেলাম অবশ্য তুটি দশ টাকার নোট। নবাব আর ফকিরের বরাত তো আর এক নয়।

কাজল আর কথা বলল না। কেন যে অরবিন্দ ট্যাক্সিতে এল, কার জন্য, সেটুকু বুঝতে কাজলের একটুও অস্থবিধা হল না। কিন্তু ভালই লাগছে বিকেলের পড়ন্ত রোদে, জনতার পাশ কাটিয়ে রুদ্ধ-

শ্বাস এই গতি। • কাজলের মনের সঙ্গে স্পিডোমিটারের কাঁটার কোথায় যেন মিল আছে। শুধু মোটরের গতি সামনের দিকে, আর কাজলের মন কেবল পাক খেয়ে খেয়ে অতীতের দিকে ফিরে যেতে চাইছে। দিলীপের সঙ্গে কাটানো এক মুঠো দিন। ওর জীবনের বালুচরে সোনা চিকচিক সঞ্চয়। ভবিষ্যতজীবনের নির্ভর।

হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি থামতে কাজলের টনক নড়ল।

গাড়ি আধ ঘণ্টা লেট।

অরবিন্দই বলল, চলুন বইয়ের স্টলটা একবার ঘুরে আসি।

কাজল আর অরবিন্দ পাশাপাশি দাঁড়াল। বেশীর ভাগই হালকা পত্রিকা। অরবিন্দ পিছনে আলমারিতে সাজানো বইয়ের দিকে নজর দিল।

দেখেছেন এরা কত সস্তা সিরিজের সব বই বের করেছে। নামকরা সব ক্লাসিক প্রায় নামমাত্র মূল্যে দিচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়েই অরবিন্দ অবাক। কোথায় কাজল! অনেকদূরে একটা থামে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অরবিন্দ দ্রুতপায়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল।

কি ভাবছেন বলুন তো?

কাজল চমকে মুখ ফেরাল। কি যে ভাবছে তা সে নিজেই জানে না, অরবিন্দকে কি বলবে। বলল, ভাবছি, এভাবে খালি হাতে দিলীপবাবুকে অভ্যর্থনা করতে আসা কি ঠিক?

অরবিন্দ হাসল, দুজনে দুটো গাঁদাফুলের মালা হাতে করে এলে ব্যাপারটা আরো মারাত্মক হত। তাছাড়া আমরা তো আর অভ্যর্থনা করতে আসিনি, যারা আসবে তারা মালাও নিয়ে আসবে।

দিলীপবাবুর বক্তৃতা আমরা শুনতে পাব তো, না শুধু সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভ্যদের জন্য বন্দোবস্ত?

কি যে বলেন, আমরা শুনব না তো শুনবে কে? এদেশে এসব বক্তৃতা শুনতে লোক হয় নাকি, শেষকালে কর্মকর্তারা রাস্তায় বেরিয়ে.

লোক ধরে ধরে নিয়ে যান। গানের জলসা টলসা হয়, সারারাত ধরে জাগবার জন্য ফুটপাতেই মারপিট।

অরবিন্দ আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দূরে ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যেতে থেমে গেল। এগোতে এগোতে বলল, চলুন প্ল্যাট-ফর্মের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ান যাক।

কিছুক্ষণ লৌহদানবের যান্ত্রিক শব্দে, লোকজনের কোলাহলে কিছু শোনার উপায় নেই। পাঁচ মিশেলী যাত্রী। পাঞ্জাব সিন্ধু গুর্জর মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ সবাই রয়েছে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে।

অরবিন্দ আচমকা কাজলের হাতটা চেপে ধরল, ওই যে দিলীপদা!

কাজল আগেই দেখেছিল। ভিড়ের জন্য এগোতে পারে নি, কিন্তু নিমেষের জন্য চোখ সরায় নি দিলীপের দিক থেকে।

আরো শীর্ণ হয়ে গেছে দিলীপ। তামাটে হয়েছে গায়ের রং! কানের পাশে কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে রূপোলী আভাস।

হৃষ্টপুষ্ট দুটি ভদ্রলোক সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওরই মধ্যে একজন সত্যি সত্যিই মালা পরিয়ে দিল দিলীপের গলায়। দিলীপ মালাটা খুলে হাতে নিল।

কোনরকমে ঠেলে ঠুলে অরবিন্দ গিয়ে পৌঁছাল। হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল।

দিলীপ একটা হাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। সহাস্যে বলল, তারপর অরবিন্দবাবুর কি খবর?

খবর তো আপনার। আপনাকে নিয়েই খবর। আমি রিপোর্টারদেরও অস্পৃশ্য।

কাজল নিচু হতে গিয়েও কি ভেবে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দুটো হাত বুকের কাছে জড়ো করে বলল, নমস্কার!

দিলীপ গলার আওয়াজে মুখ ফেরাল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল কাজলের দিকে, তারপরে ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস এনে বলল, আরে আপনিও এসেছেন। অরবিন্দটা টেনে এনেছে বুঝি?

আপনার কি ধারণা কেউ টেনে না আনলে আমি আসতে পারি না?

দিলীপ হাসল, তারপর অরবিন্দর দিকে চেয়ে বলল, তুমি তোমার দাদার কলেজেই পড়াচ্ছ তো?

আমি পড়াব দাদার কলেজে! তবেই হয়েছে। আমি কিছুই করছি না দিলীপদা, ভাবছি এবার আপনার সঙ্গে চলে যাব।

আমার সঙ্গে! দিলীপের হাসি অম্লান। অরবিন্দর দিক থেকে চোখ ফেরাল কাজলের দিকে। তার চোখের ওপর চোখ রাখল।

সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল কাজলের। দু'চোখে অসহ্য জ্বালা। অরবিন্দর মতন করে সেও যদি বলতে পারত, আমি তোমার সঙ্গে যাব দিলীপ। তোমার কর্মক্ষেত্র থেকে আমায় সরিয়ে দিও না। একজনের কাজ দুজনে ভাগ করে নেব। একজনের সুখ, দুঃখ, ব্যথা বেদনাও দুজনের হবে।

কিন্তু বুকের আকাঙ্খাকে মুখের ভাষায় রূপ দেবার শক্তি নেই কাজলের। আজও তার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। তেমনি নাগপাশে জড়িয়ে আছে সংসার। আরো অসহায়, আরো নিঃসম্বল তিনটি প্রাণী ম্লান মুখে তার দিকে চেয়ে আছে। দিলীপের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার তার কোন উপায় নেই।

ভদ্রলোক দুটি ট্যাক্সির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কাজল আর অরবিন্দর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল, তারপর মুখ ফুটে একজন বলেই ফেলল, আপনারা কোন দিকে যাবেন?

অরবিন্দই উত্তর দিল, আপনারা যান, আমরা একটু পরে যাব।

ভদ্রলোকরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ছোট ট্যাক্সি। কোনরকমে তিনজনের যাওয়া চলে। মেয়েছেলে থাকলে খুবই অসুবিধা।

দিলীপ কুলিকে নির্দেশ দিল বাক্স বিছানা গাড়িতে তোলবার। মালাটা পাশে দাঁড়ান কাজলের হাতে তুলে দিল। বলল, মালা

নিয়ে নামলে আশপাশের লোকেরা হোমরা চোমরা দেশনেতাই ভেবে বসবে। এটা বরং আপনার কাছেই থাক।

গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে অরবিন্দর দিকে ঝুঁকে দিলীপ বলল, তুমি তো সম্মেলনের অফিস চেনো? আমি ক'টা দিন সেখানেই থাকব, এঁদের আশ্রয়ে। সময় করে এসো একবার।

অরবিন্দ ঘাড় নাড়ল। ট্যাক্সির পুচ্ছবিন্দুটি অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অরবিন্দ চোখ ফেরাল না, তারপর চোখ ফিরিয়েই অবাক।

কাজল হাতে মালা নিয়ে কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গার এলোমেলো হাওয়ায় চুলের রাশ উড়ছে, উড়ছে শাড়ির আঁচল।

কাজলদি! অরবিন্দ একটু জোরেই ডাকল।

উঁ। কাজল যেন অনেক দূর থেকে উত্তর দিল। অন্য এক রাজ্য থেকে।

চলুন আমরা যাই।

চল। কাজল ছু'এক পা এগিয়ে থেমে গেল, কিন্তু এই মালা নিয়ে আমি কি করি অরবিন্দ? এ মালা হাতে নিয়ে নামলে আমার আশপাশের লোকই বা ভাববে কি?

এই রাতে লোকের ভাববার জন্য বয়ে গেছে। তাছাড়া ভাবেই যদি, ভাববে আপনি কোন সভাসমিতি করে এলেন। লেকচারারদের যা প্রায় একচেটে ব্যাবসা।

কাজল কোন কথা বলল না। একটু এগিয়ে হাতের ইসারায় একটা ট্যাক্সি ডাকল।

ট্যাক্সিতে যাবেন? আমি ভেবেছিলাম গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা যাব। অরবিন্দের গলায় বিস্ময়ের রেশ।

বড্ড ক্লান্ত লাগছে অরবিন্দ। এ অবস্থায় হাঁটতে আর ভাল লাগবে না।

তুজনে পাশাপাশি বসল। খুব সন্তর্পণে কাজল মালাটা কোলের

ওপর রাখল। বিগ্রহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে মুখচোখের এমনি ভাব, কিংবা প্রসাদী নির্মাল্য। এ কথা অরবিন্দকে বলা যায় না অরবিন্দকে কেন, পৃথিবীর কাউকেই বুঝি বলার নয়। দশজনের ছোঁয়াছুঁয়িতে এ মালা অপবিত্র হয়ে যাবে, পথের ধূলোয় শুচিতা হারাবে, তাই ট্যাক্সি ডাকল কাজল। নয়তো মাসের শেষে এ বিলাসিতার কোন মানে হয় না, অন্ততঃ কাজলের মতন পরিমিত-আয়ের কোন মেয়ের পক্ষে।

সারাক্ষণ কোন কথা হল না। কাজল হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। অরবিন্দও নির্বাক।

রাস্তার মোড়ে এসে কাজলের খেয়াল হল। অরবিন্দর দিকে ফিরে বলল, তুমি তো এখানে নামবে অরবিন্দ ?

হ্যাঁ, এখানেই নেমে যাই। আপনার শরীরটা এখন কেমন বোধ হচ্ছে কাজলদি ?

অনেকটা ভাল। কাজল সহজ গলায় উত্তর দেবার চেষ্টা করল।

অরবিন্দ দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কাল কলেজে বিকেলের দিকে একবার দেখা করব, এই ধরুন চারটে নাগাদ।

কাজল ঘাড় নাড়ল।

চারটের অনেক আগেই অরবিন্দ এসে হাজির। কাজলের ক্লাশ তিনটেয় শেষ। অরবিন্দ দাঁড়াতেই সে বেরিয়ে এল।

কি ব্যাপার অরবিন্দ ?

ব্যাপার কিছু নয়, দিলীপদার বক্তৃতা শুনতে যাবেন তো ?

সে তো পাঁচটায় আরম্ভ। এখন তো সাড়ে তিনটে।

চলুন না, একটু আগেই বেরিয়ে পড়ি। হলের ওপরেই দিলীপদার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। আগে গেলে কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারব।

তুমি তো খুব কাজের ছেলে অরবিন্দ, এর মধ্যেই তাঁর আস্তানার সন্ধান করে ফেলেছ ?

শুধু সন্ধান,অরবিন্দ হাসল, আজ সকালে গিয়েছিলাম দিলীপদার কাছে।

কথা শেষ করেই অরবিন্দ পকেট হাতড়ে দুটো কার্ড বের করল, বলল, একেবারে বিনা নিমন্ত্রণে যাবই বা কেন, দুজনের দুটো কার্ড নিয়ে এসেছি।

কিন্তু যেচে নিমন্ত্রণ নেওয়া বিনা নিমন্ত্রণের মতনই হয়ে দাঁড়াল না অরবিন্দ ?

হয়তো আমার বেলা তাই হল। কিন্তু আপনার বেলা নয়।

মানে ?

মানে, গিয়ে দেখলাম আপনার নাম লেখা কার্ড তৈরি রয়েছে কেবল আমারটার জন্য একটু সুপারিশ করতে হল।

কাজল হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। কাজলের নাম লেখা রয়েছে, কলেজের ঠিকানা। কিন্তু হাতের লেখা দিলীপের নয়। সম্মেলনের কর্মকর্তারা কেউ লিখে থাকবেন।

কাজল আর কথা বাড়াল না, কেবল বলল, এখনি রওনা হবে ?

চলুন না। যেতেও তো কিছু সময় লাগবে।

দুজনে যখন হলের সামনে পৌঁছল তখন চারটে দশ। লাল শালুর ওপর তুলো দিয়ে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের নাম আর প্রথম প্রতিষ্ঠার সাল লেখা। সামনে দু'একজন লোক ঘোরাঘুরি করছে। বোধ হয় সম্মেলনের সভ্যদের কেউ হবে।

পাশের ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে অরবিন্দ ওপরে উঠে এল, পিছন পিছন কাজল। দরজা ভিতর থেকে ভেজানো। একজন লোকের মৃদু স্বরে কথা শোনা যাচ্ছে।

অরবিন্দ আস্তে দরজায় টোকা দিল। মিনিট কয়েকের নিস্তব্ধতা তারপরই দিলীপের গলার আওয়াজ, ভিতরে আসুন।

দরজা ঠেলে অরবিন্দ চৌকাঠ পার হয়ে গেল। ইসারায় কাজলকে অনুসরণ করতে বলল।

একটা চেয়ারে দিলীপ বসে আছে। একটি ভদ্রলোক টাইপ করা কতকগুলো কাগজ তার সামনে রেখে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

অরবিন্দকে দেখে দিলীপ একবার মুখ তুলল।

কাজল ধীর পায়ে এগোচ্ছিল, ব্যাপার দেখে মাঝপথেই থেমে গেল।

অরবিন্দ একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, কাজলদি এসেছেন দিলীপদা।

দিলীপ চমকে মুখ তুলল। কাজলের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, আসুন, আসুন। ছোট ঘর, কোথায় যে বসতে বলব। ওই বইগুলো সরিয়ে জায়গা করে নিন।

অরবিন্দই হাত দিয়ে বইগুলো সরিয়ে কাজলের বসার জায়গা করে দিল। কাজল বসতে দিলীপ লোকটির দিকে চেয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনি এখন যান। আমি লেখাটার উপর চোখ বুলিয়ে নেব এক সময়ে।

লোকটি বাইরে যেতে দিলীপ দেয়ালে ঝোলানো ঘড়িটার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল। আর মিনিট কুড়ি, তারপরই বক্তৃতা শুরু হবার কথা।

অরবিন্দ একটা কাজ করবে ভাই, দিলীপ অরবিন্দর দিকে ঝুঁকে বসল।

বলুন ?

নিচে প্রিয়বাবু বলে একটি মোটাসোটা ভদ্রলোক ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁকে গিয়ে বল আমি ওপরেই আছি, মিটিংএর পাঁচ মিনিট আগে যেন আমাকে ডেকে নিয়ে যান।

অরবিন্দ সিঁড়ির মুখে অদৃশ্য হতেই, দিলীপ কাজলের দিকে চেয়ে বলল, এসে অবধি তোমাকে আপনি আজ্ঞে বলে বলে হাঁপিয়ে উঠেছি। তারপর তোমার খবর কি বল ?

কাজল ম্লান হাসল, আমার খবর ? কি খবর চাও বল ?

তোমার সংসারের খবর চাই না, তার ছাপ তোমার ক্লান্ত চোখের পাতায়, শুকনো ঠোঁটে ফুটে উঠেছে। তোমার নিজের খবর বল।

সংসারকে বাদ দিয়ে আমার আলাদা কোন সংজ্ঞা আছে নাকি ?

জীবনের অন্ধকার দিকটাই এত বড় করে তোল কেন বল দেখি ? তোমাকে দেখলে আমার রাজপুতনার উটগুলোর কথা মনে পড়ে। নির্বিকার চিত্তে মাইলের পর মাইল মরুভূমি পার হয়ে চলেছে। ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, জীবনের কোন আশ্বাস নেই। খুব ক্ষুধার্ত বোধ করলে কাঁটা গাছ তুলে নিয়ে চিবোচ্ছে। দু' কস বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। দুঃখ নেই, বেদনাবোধ নেই। যান্ত্রিক জীবনযাত্রা।

কাজল হাসল, একটা বিষয়ে আমি উটের চেয়েও খারাপ দিলীপ। কাঁটা গাছ চিবিয়েই তার ক্ষুধার উপশম হয়, কিন্তু আমার যে মানুষের খাদ্যে ভাগ বসাতে হয়।

দিলীপও পাল্টা হাসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, শুনলাম উদয়াস্ত পরিশ্রম করছ ? একতিল বিশ্রাম দিচ্ছ না নিজেকে। এরকম করলে শরীর যদি ভেঙে পড়ে তখন কোথায় থাকবে তোমার সংসার ?

কাজল পাশ কাটিয়ে গেল, গুপ্তচরটি কে শুনি, অরবিন্দ বুঝি ?

গুপ্তচর যেই হোক্ অভিযোগটা সত্যি কিনা বল ?

সকালে বিকালে দুটো টিউশনি করি, দুপুরে কলেজ।

সংসারের জন্য এতটা প্রয়োজন হয় ?

হয় দিলীপ, সংসারের চোখ নেই, কান নেই, হৃদয় নেই, আছে শুধু উদর, তাও বোধ হয় অতল।

দিলীপ কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে কাজলের দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা হবে। ভরা সংসারের সঙ্গে আমার পরিচয় তো বেশীদিনের নয়।

কাজল অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার খবর

তো নিলে, নিজের কথা একটু বল। চেহারাটা তো যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। কানের পাশে রূপোর রং ধরেছে জায়গায় জায়গায়। একেবারেই যত্ন নাও না শরীরের, তাই না ?

শেষ দিকে কাজলের গলার স্বর কেঁপে উঠল।

দিলীপ আড়চোখে একবার ঘড়ির দিকে দেখল। হাত দিয়ে পাশে রাখা কাগজগুলো নিতে নিতে বলল, শরীরটাকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই দিচ্ছি না। ওর দিকে নজর দিলেই পেয়ে বসে। একটু অনিয়ম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু অযত্ন একটুও নয়। সুখলাল রয়েছে, সেই পাচক, দেহরক্ষী, সচিব সব কিছু। মাঝে মাঝে ভাতটা পুড়িয়ে ফেলে এই যা, তবে যখন খেতে বসি তখন পোড়া আধপোড়ায় তফাত বোঝবার মতন মনের অবস্থা থাকে না, দেহের অবস্থা তো নয়ই।

কাজল মুখ ঘুরিয়ে নিল। না ঘুরিয়ে উপায় নেই। চোখের কূল ছাপিয়ে জলের স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো জোরে ঘসে নিল।

দরজায় করাঘাতের শব্দ। উঠে দাঁড়িয়ে দিলীপ বলল, আসুন, আমি তৈরি।

হৃষ্টপুষ্ট লোকটি দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। একটু মুখটা বাড়িয়ে বলল, এখন নিচে নামবার দরকার নেই দিলীপবাবু। লোক এখনও তেমন হয়নি। তাছাড়া ডক্টর ঘোষাল এইমাত্র ফোন করলেন, সিনেটের মিটিং সেরে এখানে আসতে তাঁর একটু দেরী হবে। এই কথাটাই বলতে এলাম। আপনি বসুন, ঠিক সময়ে এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

দিলীপ আবার বসে পড়ল চেয়ারে। হাতের কাগজগুলো পাশে রেখে দিল।

এবারে কাজল কথা বলল, আর কতদিন তোমায় থাকতে হবে ওখানে ?

দিলীপ শব্দ করে হাসল, যক্ষের নির্বাসন কবে শেষ হবে ?

সরকার থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা দিচ্ছে আমাকে। রাজস্থানের মূর্তি নিয়ে ঘোরালো রকমের থিসিস্ না লিখতে পারা পর্যন্ত থাকতেই হবে। তাছাড়া এখানে এসেই বা কি করব। তোমার মতন সকাল বিকাল টিউশনি সম্বল করে তো চলতে হবে। দেশের লোকের তো এই নমুনা। এ সব মিটিংয়ে লোকই হয় না, এর চেয়ে আমার ওখানকার লোকজন ঢের ভাল। নতুন মূর্তি যেদিন পাথরের তলা থেকে বের হয় সেদিন তো মেলা বসে যায়। নাচ, গান, হৈ-চৈ। তবে ডক্টর বসাক ঘুমন্ত নগরীর যে কথা বলেছিলেন, তার খোঁজ পাওয়া যায় নি। গোটা চারেক মূর্তি, তাও সবই ভাঙা, পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে। সেইজন্য আমাকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এক জায়গায় আস্তানা বেঁধে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

সবই বুঝল কাজল। নির্বাসনই যদি হয়, তবে ত' নির্বাসন-দণ্ড দিলীপ স্বেচ্ছায় নিয়েছে। কাজলের কাছ থেকে দূরে থাকবে বলেই।

তোমার বাড়ির খবর কি ?

দিলীপের আচমকা প্রশ্নে কাজল চমকে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, বাড়ির খবর ? তা খারাপই বা কি। মার শরীর মাঝামাঝি। ভাইবোনেরা ভালই আছে।

কথাটা বলতে বলতেই কাজলের আর একটা কথা মনে হল। দিলীপের দিকে একটু সরে বসে বলল, কালও কি তোমার বক্তৃতা আছে ?

কাল ? না, কাল পরশু ছুটি। দিলীপ ঘাড় নাড়ল।

তাহলে কাল বিকেলে এসো না আমাদের ওখানে। রাত্রে ওখানেই খাবে।

তোমাদের ওখানে ? দিলীপ মুখ তুলল। বাইরের আলোতে চশমার দুটো কাঁচ জ্বলে জ্বলে উঠল। পাংশু, বেদনাহত মুখ।

অনেক, অনেকদিন আগে একবার শুধু কাজলের বাড়ির কাছ বরাবর দিলীপ গিয়েছিল। ট্যাক্সি বাড়ির সামনে দাঁড়াক, তা

কাজল চায় নি। তারপর আর কোনদিন দিলীপ যায় নি। যাবার প্রয়োজনই হয়নি। অনেক প্রত্যাশা, অনেক প্রতিশ্রুতি ঘেরা আলো ঝলমল জীবন, কিন্তু সে জীবনের স্বাদ কাজল পায় নি। নির্মম অদৃশ্য এক হাত সে স্বপ্ন মুছে দিয়েছিল। দু'হাতে সরিয়ে দিতে হয়েছিল দিলীপকে। তাই বুঝি কাজলদের বাড়িতে যাবার কথায় এমনি বিষাদ-ম্লান হয়ে উঠল দিলীপের মুখ, এমন বেদনা-নীল।

বাড়ির ঠিকানা বোধ হয় ভুলে গেছ, না?

ঠিকানা? না ঠিকানা আমার কাছে আছে। কিন্তু মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে মূর্তির সন্ধান করতে পারি বলে নম্বর খুঁজে খুঁজে কলকাতার বাড়িও বের করতে পারব, নিজের ওপর এতটা বিশ্বাস রাখিনা কাজল।

তা সত্যি, কাজল সনিশ্বাসে বলল, আমাদের বাড়িতে তো কোনদিন তুমি যাওনি।

যেতে আর দিলে কোথায়?

কথাটা আচমকাই বুঝি বের হয়ে গেল দিলীপের মুখ থেকে। কিন্তু কাজলের অবস্থা মারাত্মক। বুকের মাঝখানে তীর বিঁধেছে। পাখা ঝাপটানো নয়, চিৎকার নয়, শুধু মৃত্যু-যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে সারা দেহ। যে কথার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে কাজল, সন্তর্পণে সরিয়ে নিচ্ছে নিজেকে, সেই মর্মান্তিক কথাটা কেমন করে দিলীপ উচ্চারণ করল। পাথরের মূর্তি ঘেঁটে ঘেঁটে পাথরের চেয়েও বুঝি কঠিন হয়ে গেছে দিলীপ। মানুষের দুঃখ বেদনা, কিছুরই পরোয়া করে না।

বাইরে অরবিন্দর গলা, দিলীপদা!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কাজল উঠে দাঁড়াল। অরবিন্দ না এলে কি হত বলা যায় না। নিজের ওপর কাজলের আর কোন বিশ্বাস নেই। একলা ঘরে দিলীপের মুখোমুখি বসে থাকার মতন মনের জোর তার নেই, তিলমাত্র সাহস নয়। হয়তো আছড়ে পড়ত

দিলীপের সামনে। চোখের জলে ভিজিয়ে দিত তুটো পা।

এস অরবিন্দ। দিলীপ কাগজগুলো তুলে নিতে নিতে ডাকল অরবিন্দকে।

অরবিন্দ ভিতরে ঢুকল না। দরজা থেকে কয়েক পা এগিয়ে বলল, চলুন এবার।

দিলীপ হাসল, লোকজন কিছু হয়েছে অরবিন্দ, না মোটা মোটা থামগুলোকেই তাম্রলিপ্তের ঐশ্বর্যের কথা শোনাতে হবে?

অরবিন্দও হাসল, কিছু লোক হয়েছে দিলীপদা। লোক জোটাতেই তো আমার এত দেরী হল। বাসস্টপে যারা দাঁড়িয়েছিল, পার্কে হাওয়া খাচ্ছিল, হাত জোড় করে তাদের সব ডেকে হলে এনে বসিয়েছি। আপনি তাড়াতাড়ি চলুন, বেশীক্ষণ তাদের আটকে রাখতে পারব এমন ভরসা কম।

অরবিন্দর কথার ভঙ্গীতে তিনজনেই হেসে উঠল। কাজল হাসল অনেকক্ষণ ধরে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিয়ে। দমকা হাওয়ায় অনেকদিনের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন হোক, উড়ে যাক শুকনো পাতার স্তূপ। শুধু তাই নয়, তুরন্ত হাওয়ায় চোখের জলের ধারাও মুছে যাক।

কাজল আশা করেছিল মিটিংয়ের শেষে দিলীপের সঙ্গে একটু দেখা করবে, কিন্তু সভা ভাঙতেই হোমরা চোমরা অধ্যাপকরা দিলীপকে ঘিরে ধরল। কাজল তাঁদের অনেককেই চেনে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে কাজল বাইরে চলে এল।

সিঁড়ির চাতালে অরবিন্দ অপেক্ষা করছিল। কাজল আসতে বলল, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কাজল হাত নেড়ে বারণ করল, কোন দরকার নেই। আমি সোজা বাড়ি যাব না, ছাত্রীর বাড়ি একবার ঘুরে যাব।

ট্রামে উঠেই কাজল মত বদলাল। কোথাও নয়, সোজা বাড়ি চলে যাবে। কারো সঙ্গে বেশী কথা বলতেও ভাল লাগছে না। কারো সঙ্গও পছন্দসই নয়। জানলায় মাথা রেখে চোখ বুজিয়ে

চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছা করছে। জনতার কোলাহল, যান-বাহনের আওয়াজ, মহানগরীর হাজার অত্যাচার কিছুই কানে আসছে না। অতীন্দ্রিয় এক জগতে পৌঁছে গেছে কাজল। এ পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের ওপরে।

নবতারার সঙ্গে দেখা হতেই কাজল কথাটা বলল, কাল একটি ভদ্রলোককে খেতে বলছি মা। রামের মাকে সকালে বাজারে যাবার সময় আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে বলো তো!

নবতারা ঘাড় নেড়ে সায় দিল, তারপর মেয়ের পিছন পিছন তার ঘরের চৌকাঠ অবধি এসে বলল, কাকে খেতে বলেছিস?

হাতব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে মাথা নিচু করে কাজল বলল, দিলীপ বাবুকে।

দিলীপবাবু কলকাতায় এসেছে এ খবর নবতারার জানা। কাজল বলেনি, বলেছে বাণী। অরবিন্দর কাছে শুনেছে।

হ্যাঁরে, চলতে চলতে নবতারা ফিরে দাঁড়াল, উনি কি এখানেই এখন বদলী হয়ে এলেন বুঝি?

মার কথার ধরণে এত দুঃখের মধ্যেও কাজলের হাসি পেল। দিলীপের সম্বন্ধে এখনও ভয় কাটেনি নবতারার। একবার তো কাজলকে প্রায় পরই করে দিয়েছিল, বহুকষ্টে সংসারের সকলে মিলে ফিরিয়ে এনেছে কাজলকে। কিন্তু শুধু তার দেহটাই ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, মন নয়। চালচলনে, হাবভাবে তাই তো মনে হয়।

আবার ফিরে এলে কেন দিলীপ। এত জায়গা থাকতে এখানে বদলী হল। যে মানুষটার কথা কাজল শুনত, পঙ্গু সে মানুষটাও তো আজ আর নেই। এবার যদি দিলীপ পুরোনো সুরে ডাকে, কাজল না ধরা দিয়ে কি থাকতে পারবে!

সব বুঝল কাজল, বুঝেই স্বল্প হেসে বলল, ভয় নেই মা, বদলী হন নি। একটা কাজে দিনকতকের জন্য এসেছেন, কাজ শেষ হলেই চলে যাবেন।

ধরা পড়ে একটু বিব্রত হল নবতারা। গলার স্বর চড়িয়ে বলল,

আমার আর ভয়ই বা কি, ভরসাই বা কিসের বাছা। আমি তো মরা মানুষ। তোমাদের দয়ার ওপর রয়েছি। এ বাড়িতে আমার কথা বলতে আসাই অন্যায়।

কাজল প্রমাদ গুণল। নবতারার কথা কিছু বলা যায় না। এখনি হয় তো কাঁদতে বসবে পা ছড়িয়ে। মৃত স্বামীর উল্লেখ করে কপাল চাপড়াবে।

কাজল এগিয়ে এসে ছ'হাতে মাকে জাপটে ধরল। মুখে বলল, এত ছিঁচ-কাঁদুনে কেন হয়েছো বলতো মা? কথায় কথায় চোখের জল। দিলীপবাবু এখন মস্ত বড় লোক। সারা দেশে তাঁর নাম। তোমার এই কালো মেয়ের জন্য তাঁর তো ঘুম হচ্ছে না। কবে কখন কি হয়েছিল, তা আজ তাঁর মনেও নেই।

নবতারা চোখ মুছল। অবশ্য একফোঁটা জল আসেওনি চোখে, সামান্য একটু লালচে হয়েছিল শুধু। আড়চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। কি ব্যাপার! আজ যে কাজল এত হাসি খুশি।

নবতারা কথাটা বলল খেতে বসে। বলার আগে মেয়ের মুখের দিকে দেখল কিছুক্ষণ। একটু অপেক্ষা করল। বাণী কি একটা পড়ার কথা বলতে এসেছিল দিদিকে, সে চলে যেতেই নবতারা কথাটা পাড়ল।

একটা কথা বলছিলাম কাজল।

খেতে খেতে কাজল মুখ তুলল। আবার কি কথা? ছদিন হল সংসারের সমস্ত টাকা তো তুলে দিয়েছে মার হাতে। শুধু টাকা নয়, এক জোড়া থান, মণ্টুর সার্টের ছিট, বাণীর ছ'খানা বই। তবে এর মধ্যে আবার টাকার কি দরকার পড়ল!

কি কথা মা? নিরাসক্ত গলা কাজলের।

ইয়ে, কালকে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে অরবিন্দকেও বললে হয় না? বাড়তি একটা লোকের জন্য আর কি এমন বেশী খরচ?

হাতের গ্রাস কাজল পাতে নামিয়ে রাখল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে

চেয়ে রইল নবতারার দিকে। তারপর বলল, *তুমি ঠিক বলেছ মা।* কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিল না।

শুতে গিয়েও কথাটা কাজল ভাবল। এ একরকম ভালই হয়েছে। একলা দিলীপ এলে নিজের আড়ষ্ট ভাবটা কাজল কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারত না। কি কথায় কি কথা এসে পড়ত। পর্দার আড়ালে নবতারা দাঁড়িয়ে থাকত। কান পেতে শোনার চেষ্টা করত এদের কথাবার্তা। যতই মাকে বোঝাক কাজল, নবতারা এখনও নিঃসন্দেহ নয়। তার এখনও ধারণা, সংসারের সব দায়িত্ব ছেড়ে হঠাৎ দিলীপের হাত ধরে চলেও যেতে পারে কাজল। এতদিন সংসারে রয়েছে বটে, মুখে রক্ত উঠিয়ে সংসারের সব প্রয়োজন মেটাচ্ছে, কিন্তু এ সংসারকে কাজল কোনদিন ভালবাসতে পারেনি। সবাই মিলে চেপে ধরে ওকে আটকে রেখেছে এখানে, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি নবতারার আছে।

তার চেয়ে অরবিন্দ থাকবে পাশে। হালকা হাওয়ায় মেঘের ভার উড়িয়ে নিয়ে যাবে। জড়তা কেটে যাবে কাজলের। তাছাড়া অরবিন্দকে বাদ দিয়ে দিলীপকে খেতে বলাটাও ভারি বিশ্রী হত, এই সহজ কথাটা কেন যে কাজলের এতক্ষণ মনে আসেনি, এটাই আশ্চর্য।

সকালে ছাত্রীর বাড়ি থেকেই কাজল অরবিন্দর বাড়িতে ফোন করল।

সবে অরবিন্দ বাইরে বেরোচ্ছিল, ফিরে এসে ফোন ধরল।

কাল একটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে ভাই।

কি, ওই বক্তৃতা শুনতে যাওয়া তো? ঠিক বলেছেন। দিলীপদার কথাগুলো যাও বা একটু বুঝতে পেরেছিলাম, সভাপতি-মশাই বিস্তারিত বোঝাবার ছলে কি যে বললেন এক বর্ণও মাথায় ঢোকে নি। অবশ্য আমি নিজের কথা বলছি।

না না, সে সব কিছু নয়।

তবে?

কাল তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি ভাই গোলমালে খেয়ালই ছিল না। আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে খাবে। দিলীপবাবুও আসছেন। ফোনে নিমন্ত্রণ করলাম, কিছু মনে করলে না তো?

না হয় বুদ্ধি আমার একটু কম কাজলদি, তা বলে এতটা কম তা ভাববেন না। অত সামাজিকতা মেনে চলতে গেলে নিমন্ত্রণ পাওয়াই দুষ্কর হয়ে উঠবে। কানে শুনলেই আমি গিয়ে হাজির হই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। দিলীপদাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

সত্যিই কাজল নিশ্চিন্ত হল। অরবিন্দ এলে আর ভয় নেই। কোন অসুবিধা নয়।

কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেই কাজল অবাক।

নবতারা আর বাণী দুজনে গাছ-কোমর বেঁধে বাড়ি-সংস্কারে লেগেছে। টেবিল চেয়ার ঝাড়া মোছা হয়েছে। জানলা দরজায় পর্দা। এ পর্দা বহু আগে কাজলই কিনে এনে দিয়েছিল, অফিসে কি একটা বাড়তি টাকা পেয়ে। এতদিন ব্যবহার করা হয়নি। কাঁচের গ্লাসে টেবিলের ওপর রজনীগন্ধার গোছা। বিছানার ওপর ফর্সা একটা সুজনি ঢেকে ময়লা বালিশ আর চাদরের আব্রু বাঁচাবার চেষ্টা। মণ্টু ঘুরে ঘুরে সব তদারক করছে।

বাবা, কি ব্যাপার গো তোমাদের বাড়ির। কথাটা জোর গলায় বললেও খুশির আমেজ লেগে ছিল কাজলের গলার স্বরে।

নবতারা হেঁট হয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল, সোজা হয়ে উত্তর দিল, ঘরদোরের যা ছিরি হয়েছিল। মানুষজন আসবে, কিছুটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে না?

কাজল কোন কথা বলল না। কাপড় জামা বদলে নিজেও কাজে লেগে গেল। নবতারাকে বলল, তুমি রান্নার দিকটা দেখো মা। আমরা দুই বোনে এদিকের কাজ করছি।

দিলীপ আর অরবিন্দ একসঙ্গে এসে পৌঁছল। অরবিন্দ দিলীপের কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে। ফোনেও তাই বলেছিল।

কাজল বাণী আর মণ্টুকে নিয়ে এল। তুজনে হেঁট হয়ে দিলীপকে প্রণাম করল। তারপর অরবিন্দকে।

দিলীপ মণ্টুকে কাছে টেনে নিল, তোমার সঙ্গে তো আমার দেখা হয়েছে আগে। সেই আমাকে স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েছিলে তুমি?

মণ্টু হাসল। বলল, হ্যাঁ মনে আছে। দিদি আপনাকে ফুল দিলে আর তার বদলে আপনি দিলেন নটরাজের মূর্তি?

কাজলের অবস্থা কাহিল। মুখের চেহারা লুকোতে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

দিলীপ কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। মণ্টুর পিঠ চাপড়ে বলল, বা, তোমার তো বেশ স্মরণশক্তি, ঠিক মনে আছে তো!

অরবিন্দ চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল। মণ্টুর হাত ধরে বলল, চল মণ্টুবাবু, আমরা ভেতরের ঘরে গিয়ে বসি। মোহনবাগানের শীল্ড ফাইনালের গল্পটা তোমায় বলাই হয়নি।

মণ্টু আর অরবিন্দর পিছন পিছন বাণীও চলে যাচ্ছিল, কাজল তাকে ডাকল।

বাণী ফিরতে দিলীপের দিকে চেয়ে কাজল বলল, একে বোধ হয় আপনি দেখেন নি কোনদিন?

কাকেই বা দেখেছি! দিলীপ মৃতু হাসল।

এবারে ম্যাট্রিক দেবে।

তাই বুঝি, বাঃ! তারপর পাশ করলে কি পড়াবেন, আর্টস না সায়েন্স?

ওদিকেই যাব না, ভালো একটি ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেব।

আঃ দিদি, মুখচোখের অপরূপ ভঙ্গী করে বাণী ছুটে পালাল।

দিলীপ চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল। আলোর সামনাসামনি। হেসে

বলল, নিজে এতদূর পড়লেন আর বোনের বেলা ম্যাট্রিকেই যে খতম ?

আমি পড়েছিলাম উপায় নেই বলে, ও পড়তে যাবে কোন্ দুঃখে। আমার মতন অন্ধকারের রঙ নিয়ে তো আর জন্মায়নি। চোখ মুখের এমন শ্রীও নয়।

তাহলে আপনার সংসারের পাষাণভার ওর ঘাড়ে আর চাপাবেন না ?

ইচ্ছা থাকলেও দিলীপ তুমি বলতে পারল না, কাজলকে। দোরগোড়ায় পর্দার ওপাশে হয়তো কাজলের মা দাঁড়িয়ে আছে, অরবিন্দ আছে ধারে কাছে কোথাও, কোন্খান দিয়ে কে শুনে ফেলবে, কি ভাববে মনে। তার চেয়ে ও অন্তরঙ্গতায় না নেমে আসাই ভাল। দিলীপ তো চলে যাবে দুদিন পরে। তারপর কৈফিয়ত দিতে হবে কাজলকে।

দিলীপের কথার উত্তরে কাজল ঘাড় নাড়ল, না, জগন্নাথের রথের চাকায় একটা প্রাণই পিষে যাক, তাতেই অখণ্ড পুণ্য। সেই পুণ্যেই রথের গতি বাড়বে। বলি বাড়াবার আর প্রয়োজন নেই।

দুজনে চুপচাপ। কাজল দাঁড়িয়ে রইল জানলার ধার ঘেঁসে। দিলীপ টেবিল-ক্লথের সূচি-শিল্পের দিকে মনোযোগ দিল।

পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে অরবিন্দ আর মন্টুর গলা ভেসে এল। ফাঁকে ফাঁকে বাণীর লজ্জা জড়ানো স্বরে দু'একটা কথা।

কাজল জানলার ধার থেকে সরে এসে টেবিলের কাছ বরাবর দাঁড়াল।

আপনার যাওয়ার দিন ঠিক হয়ে গেছে ?

প্রায়। বোধ হয় দিন দশেক পরেই রওনা হব। দশ দিনের চুক্তিতে এসেছিলাম, নিজের কতকগুলো বইপত্র কিনতে হবে। তাতে কদিন দেরী হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিলে উত্তর দেবেন তো ? খুব আস্তে কাজল কথাগুলো বলল। অন্য লোকের কান বাঁচিয়ে।

দিলীপ চমকে মুখ তুলল। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে জরিপ করল কাজলের চোখের দৃষ্টি, মুখের ভঙ্গী। তারপর বলল, চিঠি দিয়ে উত্তর পান নি, এমন কি হয়েছে? মাঝে মাঝে নতুন মূর্তির সন্ধানে অনেক দূর চলে যেতে হয়, সময়ে চিঠি পাই না, তাই উত্তর দিতেও একটু দেরী হয়, কিন্তু উত্তর দিই না এমন অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

দরজায় করাঘাতের শব্দ। এই শব্দের অর্থ কাজলের অজানা নয়। নবতারার ডাকার এইটেই চিরাচরিত পদ্ধতি। অবশ্য বাইরের ঘরে লোক থাকলে।

কি মা? পর্দা সরিয়ে কাজল চৌকাঠের এ পাশে এসে দাঁড়াল।

এবার খাবার জায়গা করি, কি বল?

হ্যাঁ, দেরী করে আর লাভ কি। কাজল সায় দিল।

থালার সামনে বসেই দিলীপ চেঁচিয়ে উঠল, সর্বনাশ, এ যে আমার এক সপ্তাহের খোরাক। কিছু তোলবার ব্যবস্থা করুন।

কাজল সামনে বসেছিল। নবতারার নির্দেশে বাণী পরিবেশন করছিল। দিলীপের কথায় কেউ কান দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না।

খেতে খেতেই অরবিন্দ বলল, দিলীপদা, আমার কথাটা মনে আছে তো?

কি কথা ভাই?

আপনার সঙ্গে আমার যাবার। মূর্তির ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি না পারি, আপনার দেখাশোনা তো করতে পারব।

কথার মাঝখানে কাজল কথা বলল, সেদিকেও আশা নেই অরবিন্দ, কোন এক সুখলাল চাকরিতে কায়েম হয়ে গেছে। পোড়া ভাতে স্পেশালিস্ট।

দিলীপ মুচকি মুচকি হাসল, একজন সহকারী পেলে মন্দ হয়

না। কাজকর্মের অবসরে অন্ততঃ কথা বলবার একটা লোক পাই।

মাথা নিচু করে দিলীপ কথাগুলো বলল, কিন্তু কথা শেষ করে মুখ তুলে চাইল কাজলের দিকে।

দু' হাঁটুর ওপর মুখ রেখে কাজল তদারক করছিল, দিলীপের সোজাসুজি দৃষ্টির সামনে পড়ে কুঁকড়ে গেল।

পিছনে দরজার কাছে নবতারা। সবই নিশ্চয় তার নজরে পড়েছে। মেয়েকে সহকারী করে সরিয়ে নিয়ে যাবার বুঝি মতলব করছে দিলীপ। কথাবার্তায় তারই আভাস। গোটা সংসারকে পথে বসিয়ে। অনাথ করে সংসারের প্রাণীদের।

কাজল বাণীর দিকে ফিরে বলল, দাঁড়িয়ে দেখছ কি বাণী, অরবিন্দকে খানকতক লুচি এনে দাও।

দু' হাত আড়াল দিয়ে অরবিন্দ থালার ওপর প্রায় উপুড় হয়ে পড়ল, সর্বনাশ, আমাকে আপনারা কি ভেবেছেন বলুন তো? একটু বেশী কথা বলি বলে খাইও যে বেশী এমন ধারণা আপনাদের কি করে হল?

তোমার রিসার্চের কতদূর অরবিন্দ? মনে হচ্ছে তুমি যেন একবার লিখেছিলে ডক্টর রাহার সঙ্গে তুমি কাজ আরম্ভ করেছ। 'মৌর্যযুগের অলঙ্কার' সম্বন্ধে বোধ হয় গবেষণা করছ তোমরা, তাই না? বিষয়টা খুব ভাল। এগিয়েছ কিছুটা?

এগোতে আর পারলাম কোথায়। দাদা নোটিশ দিয়েছে চাকরি জুটিয়ে নিতে হবে। এ ভাবে বসে থাকলে চলবে না। আপনি যাবার আগে দাদাকে একটু বুঝিয়ে যান দিলীপদা। চৌকাঠে চৌকাঠে মাথা খুঁড়ে বেসরকারী কোন কলেজে হয়তো চাকরি একটা পেয়ে যেতে পারি, কিন্তু যা মাইনে, তাতে পেটও ভরবে না, মানও অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

মনোজটা চিরকালের পাগল। সেদিন দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে। কলেজ নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। হাতের কাছে যা টাকা-

কড়ি ছিল সব ঢেলেছে কলেজে। বললে, যেমন করে হোক, কলেজটা দাঁড় করাবেই। তোমার কথাও হল কিছু কিছু।

আমার কথা?

হ্যাঁ, আমিই জিজ্ঞাসা করলাম তোমার রিসার্চের কথা। মনোজ বললে, রিসার্চ কি করছে ভগবান জানে, তবে তোমার খাতাপত্রের মধ্যে বুঝি গোটা চারেক সনেট পেয়েছে।

কাজল হাসিতে ভেঙে পড়ল। আঁচল মুখে গুঁজে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, মৌর্য-যুগের অলঙ্কারের ব্যাপারটা বুঝি কাব্যেই লিখছ অরবিন্দ? তুমি যে কবি, প্রফেসর বসাক এ কথা একবার বলেছিলেন বটে।

অরবিন্দ মুখ তুলল না। ঘাড় হেঁট করে বলল, এরকমভাবে অপমান করার চেয়ে লুচিই বরং দিন কয়েকখানা। সে অত্যাচার সইতে রাজি আছি।

লুচি হাতে বাণী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। অরবিন্দর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার পাতে লুচির গোছা ফেলে দিল।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই মণ্টু অরবিন্দকে বলল, যাবার আগে মার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন অরবিন্দদা।

মুখ ধুয়ে মণ্টুর পিছন পিছন অরবিন্দ ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দিলীপ বাণীর হাত থেকে পান নিয়ে কাজলের দিকে ফিরে বলল, বা, অরবিন্দ একেবারে বাড়ির ছেলে হয়ে গেছে। সদর অন্দর সব জায়গাতেই সমান প্রতিপত্তি।

কাজল হাসল, এ বাড়িতে আমার চেয়েও ওর প্রভাব বেশী। মণ্টু তো অরবিন্দদা বলতে অজ্ঞান। মার সংসারের যত খুঁটিনাটি কথা অরবিন্দর সঙ্গে।

বাণী একটু সরে যেতেই দিলীপ চাপা গলায় বলল, চলুন আপনার ঘরটা দেখে আসি।

আমার ঘর! কাজলের দু'চোখে বিস্ময়ের ছায়া।

রাত্রিবাস যখন করেন এখানে, তখন ঘর নিশ্চয় একটা আছে। একবার দেখে যাই ঘরটা।

এর ওপর কথা চলে না।

কাজল এগিয়ে এসে পর্দা সরিয়ে সুইচ টিপল।

ছোট্ট বিছানা। কি ভাগ্যিস বুদ্ধি করে কাজল একটা চাদর টেনে দিয়েছিল তার ওপর। টেবিলের ওপর হাতব্যাগ, প্রসাধনের টুকিটাকি, ছু-একটা বই অগোছালভাবে রাখা। চেয়ারের ওপর শাড়ি জড়ো করা।

কাজল ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি আজকের দিনে ওর ঘরে কেউ আসতে চাইবে। সেইজন্যই এঘরটা বাদ দিয়ে অন্য ঘরগুলো সংস্কার করেছিল।

দেখছেন ঘরের অবস্থা!

ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলতে গিয়েই কাজল অবাক। দিলীপ পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। বিস্ফারিত ছুটি চোখ।

দিলীপের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে গিয়েই কাজল লজ্জা পেল। আঁচল দিয়ে মুখটা ঢাকা দিল। থরথর কাঁপছে ছুটো ঠোঁট। শুধু কি ঠোঁট। সারা দেহ কাঁপছে বাতাস লাগা বাঁশ-পাতার মতন।

জানলার তাকে দাঁড় করানো নটরাজ মূর্তি। তার পাশেই ফুলের একটা মালা। পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়েছে, বর্ণ নেই, সুরভি নেই, মালা বলে চেনাই ছুস্কর। কিন্তু চেনা যে গিয়েছে তার ছাপ দিলীপের ছু'চোখের দৃষ্টিতে।

রোজই সকালে কাজল মালাটা ফেলে দিতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মালাটা ছু'হাতের মধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছে। এ আবর্জনা ঘরে রেখে আর লাভ কি। ফেলে দিলেই হয়। কিন্তু ফেলতে কাজল পারেনি। যখনি মনে হয়েছে, এ মালা দিলীপের দেওয়া, তখনি আর হাত সরেনি। আস্তে আস্তে মালাটা নামিয়ে রেখেছে। মনে হয়েছে বর্ণ, গন্ধ,

লালিত্য কিছুই হয়তো নেই, কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে একটা মানুষের স্মৃতি। এ মালা ফেলে দেওয়া মানে তার স্মৃতিকে মুছে ফেলা।

মাথা নিচু করেই কাজল শুনল। দিলীপের গলা।

আমার ওখানেও ঠিক এমনি অবস্থায় একটা ফুলের গোছা শুকোচ্ছে কাজল। ফেলে দিতে গিয়ে সুখলাল কতদিন ধমক খেয়েছে। ফুলগুলো শুকিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়েছে চারদিকে, তবু সে জায়গাটা কাউকে ঝাঁটও দিতে দিই না, পাছে জঞ্জাল ভেবে সে গুঁড়ো কেউ বাইরে ফেলে দেয়।

দিলীপ !

অব্যক্ত কান্নায় মেশানো একটা আর্তনাদ। দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে কাজল নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। হৃৎস্পন্দনের দ্রুততালে এখনি বুঝি সর্বনাশ হয়ে যাবে। এত কষ্টের গড়ে তোলা সংযমের বাঁধ ফেটে চৌচির, অবরুদ্ধ কান্না সমুদ্রের শক্তি নিয়ে সব ভেঙে চুরমার করে দেবে।

খুব আস্তে দিলীপ বলল, সংযত গলায়, নমস্কার, আজ চলি। অনেক রাত হয়ে গেল। যদি সম্ভব হয়, আর একবার দেখা করবেন।

খাটের বাজুতে মাথা রেখে কাজল চুপচাপ বসে রইল। নিষ্পলক দুটি চোখ মেলে দেখল পর্দা সরিয়ে দিলীপ বাইরে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দ। পর্দার ওপার থেকেই অরবিন্দর গলা, কাজলদি, আজ চলি।

তারপর মুঠো মুঠো অন্ধকার। সে অন্ধকারে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে কাজল। হারিয়ে যাচ্ছে।

সকালের দিকে মাথা তুলতে গিয়েই কাজল বাধা পেল। মাথায় যেন পাথরের ভার। জ্বালা করছে দুটো চোখ। অসহ্য পিপাসা। তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। চোখ দুটো বন্ধ করে আবার সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

হ্যাঁরে, অনেক বেলা হয়ে গেল যে।

নবতারা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। মেয়ের সাড় নেই। এগিয়ে এসে কাজলের কপালে হাত রেখেই চমকে উঠল। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। হাত রাখা দায়। পায়ের তলায় গুটিয়ে রাখা চাদরটা খুলে নবতারা কাজলেরগায়ে ঢাকা দিয়ে দিল।

বাণী রান্নাঘরে ছিল, তাকে ডেকে নবতারা বলল, বাণী, কাজলের গা খুব গরম। অনেকবার ডাকলাম, সাড়াই দিল না।

হলুদের হাত শাড়িতে মুছে বাণী মার কাছে এসে দাঁড়াল, কি হবে মা?

কাজলের যে কোনদিন অসুখ বিসুখ হতে পারে এ যেন বাড়ির সকলের ধারণার বাইরে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ছুটোছুটি করছে। অনিয়মের অন্ত নেই, তবু একদিনের জন্য গা গরম তো দূরের কথা, একটু সর্দি কাশিও কাজলের কোনদিন হয় নি। ইদানীং মাথা একটু ধরে, কিন্তু ওই অ্যাসপিরিনের বড়ি খেলেই সেরে যায়। আধঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিক।

ডাক্তারকে একবার খবর দিলে হয়। ভয়-ভরা দু'চোখ তুলে বাণী মার দিকে চাইল।

আর একটু দেখি।

নবতারা আবার কাজলের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বাণীর দিকে ফিরে বলল, তুই এক কাজ কর বাণী, এখানে বসে ওর মাথায় জলপটি দে, রান্নার কাজটা আমিই করছি। কাজল যখন বেরোবে না, তখন তো আর রান্নার তাড়া নেই। তোরও বাপু আজ স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। মণ্টুর তো বেলায় স্কুল।

জ্বর যে কত বেশী তা বাণী টের পেল কপালে জলপটি দিতে বসে। মুহূর্তে শুষে নিচ্ছে জল, বার বার জলের ফোঁটা ফেলে ভিজিয়ে নিতে হচ্ছে। অসহ্য উত্তাপই শুধু নয়, বোধ হয় দেহে অসহ্য যন্ত্রণাও। মাঝে মাঝে কাতরাচ্ছে কাজল। দুটো হাত দিয়ে সামনের কি একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে

বেলা পড়তেই বাড়ির সকলে চিন্তিত হয়ে পড়ল। সারাক্ষণ বিড় বিড় করে কাজল বকল। বিকারের ঘোরে আবোল তাবোল কথা। দু' হাতের নখ দিয়ে বিছানার চাদর টেনে ধরল। চিৎকার করে উঠল, না, না, আমি যাব না। আমি কি করে যাব, বোঝ না কেন তোমরা ?

নবতারা বাইরে উঠে এসে বাণীকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, কি করি বল তো বাণী। ভয়ে আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিই মা ?

তাই যা, বরং মন্টুকে নিয়ে যা, ডাক্তারকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।

ব্যাপার দেখে নবতারা মন্টুকে স্কুলে যেতে দেয় নি। বাণীর সঙ্গে সেও বেরোল। নবতারা এসে বসল মেয়ের শিয়রে। বাড়ির ঝি রামের মা চৌকাঠে বসল।

মাঝে মাঝে কাজলের সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সারা দেহে তীব্র শিহরণ। মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে নবতারা ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করতে লাগল।

আমি বড় ভাল বুঝছি না মা, রামের মা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, এতো জ্বর জ্বারি নয়।

জ্বর জ্বারি নয়! নবতারা ঘুরে বসল, জ্বর জ্বারি নয় তো কি তবে ? গা পুড়ে যাচ্ছে মেয়ের!

ওঁদের কোপে পড়লে অমন হয় মা, কথার সঙ্গে সঙ্গে রামের মা দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল, সোমত্ত বয়সের মেয়ে, দিন নেই, রাত নেই হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়ালে ওঁদের নজরে পড়ে যায়।

নবতারা আর কিছু বলল না। বলেও লাভ নেই। কথা বাড়ালেই রামের মা ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প শুরু করবে, নিজেদের গ্রামে চোখে দেখা সব কাহিনী। সে সব শোনার মতন মনের

অবস্থা নবতারার নেই। সেরে উঠলে হয় কাজল। কতদিন অদৃষ্টে ভোগান্তি আছে কে জানে! তার চেয়ে বড় কথা কি করে চলবে সংসার। মেয়ের অসুখের এই বাড়তি খরচ মেটাবার রসদ জুটবে কোথা থেকে। টিনের কৌটোয় সামান্য ক'টা টাকা পড়ে আছে। কাজলের ড্রয়ার হাতব্যাগ হাতড়ালেও কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু সে আর কত। এখনও কলেজের মাইনে পায় নি কাজল, একটা টিউশনির টাকাও বাকি। এ সব আদায়ই বা কি করে হবে। বাণী আর মন্টু তো এ সব পারবে না।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হতেই নবতারা উঠে দাঁড়াল। ডাক্তার আসছে।

পরাশরবাবুর কল্যাণে এ পাড়ার ডাক্তারদের আর এ বাড়ি অচেনা নেই। নিত্য নতুন ডাক্তার আমদানী করতেন। যখন যার কাছে যে ডাক্তারের প্রশংসা শুনতেন তাকেই ডাকতেন। তবে এক ডাক্তারকে বেশী দিন নয়। এক শিশি ওষুধ, কিংবা গোটা পাঁচেক বড়িতে উপকার না হলেই, ডাক্তার বদল হত।

এ ডাক্তারটি একেবারে গলির মোড়ে। সব চেয়ে কাছে বলে বোধ হয় বাণী আর মন্টু এঁকেই ডেকে এনেছে।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। থার্মমিটার দিয়ে, বুকে পিঠে যন্ত্র লাগিয়ে, চোখের পাতা, জিভ সব নিরীক্ষণ করে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন।

নবতারার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, খুব ভাল বুঝছি না। দিন কতক না গেলে বলা মুস্কিল। কাউকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, ছুটো ওষুধ লিখে দেব। তেমন বাড়াবাড়ি হলে বিকেলের দিকে আমায় একবার খবর দেবেন।

ডাক্তার চলে যেতে নবতারার কথাটা মনে পড়ল। অরবিন্দকে একবার খবর পাঠালে হয়। একটু খবর পেলেই সে ছুটে আসবে। তা হলেই আর কোনদিক দেখতে হবে না।

কিন্তু খবর যে পাঠাবে, অরবিন্দর ঠিকানাও তো কেউ জানে

না। অবশ্য কলেজে তার দাদার কাছে একটা খবর পাঠানো যায়, তা হলেই অরবিন্দর কানে যাবে কথাটা। তবে কে যাবে কলেজে, অরবিন্দর দাদাকে বাণী আর মণ্টু কেউই তো চেনে না।

একটি মাত্র ভরসা। নবতারা নিজে অরবিন্দকে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসতে বলেছে। বাণীর পরীক্ষা সামনে, একটু যদি দেখিয়ে শুনিয়ে দেয়। কাজলের তো তিলমাত্র সময় নেই। রাত্রে টিউশনি শেষ করে যখন বাড়ি ফেরে তার মুখ চোখের চেহারা দেখে আবার বইখাতা সামনে নিয়ে বসার কথা বলতে সাহস হয় না নবতারার। বাণীর তো নয়ই।

অরবিন্দ রাজী হয়েছে। বলেছে সময় পেলেই আসবে। দু' একদিনের মধ্যে যদি সময় পায় অরবিন্দ। এমন বিপদে চেনা জানা আর কাউকে তো মনে পড়ছে না নবতারার।

বিকেলের দিকে কাজলের জ্বর বাড়ল। আবোল তাবোল বকুনিও। এবার রামের মা গেল মণ্টুর সঙ্গে। ডাক্তার বাইরে গিয়েছিলেন, প্রায় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর তাঁর সাক্ষাৎ মিলল।

তিনি এসেই মাথায় বরফ দেবার কথা বললেন। আর দেরী করলে চলবে না। এমনিতেই বেশ দেরী হয়ে গেছে। রামের মাকে তখনি বরফ আনতে পাঠান হল।

রোগী দেখে আবার ডাক্তার নবতারার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আপনাদের বাড়ি পুরুষ মানুষ কেউ নেই?

নবতারার পাশেই মণ্টু দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে ফিরে নবতারা বলল, পুরুষ মানুষ বলতে এই মণ্টুই সম্বল।

বড়লোক কেউ নেই? হঠাৎ রাত বিরেতে যদি দরকার পড়ে!

রাতবিরেতে দরকার পড়বে? নবতারার গলা ভয়-থমথমে।

অসুখের কথা কি কিছু বলা যায়? ধরুন যদি মাঝরাতে আমাকে ডাকারই প্রয়োজন হয়, কিংবা কোন ওষুধ আনতে হয়। মণ্টুকে দিয়ে তো আর তা-হবে না!

নবতারা মাথা নিচু করে রইল। আস্তে আস্তে বলল, বাড়িতে সে রকম পুরুষমানুষ তো কেউ নেই।

চলতে চলতে ডাক্তার বললেন, কোন আত্মীয়কে এ সময়টা এনে রাখতে পারলে ভালই হত। আপনাদের অযথা ভয় দেখাচ্ছি না। তবে বুঝতেই তো পারছেন বিপদে একটা পুরুষমানুষ কাছে থাকলে আপনারাও বুকে বল পাবেন।

সারাটা রাত মা আর মেয়ে ভাগাভাগি করে জাগল। শুধু জাগা নয়, কাজলের মাথায় বরফ দিতে হল বসে বসে। রামের মা অন্যদিন বাড়ি চলে যায়, ব্যাপার দেখে সেও রয়ে গেল।

বরাত নবতারার। সকালের দিকেই অরবিন্দ এসে হাজির। সব শুনে অবাক। একদিনে সারা বাড়ির আবহাওয়া যেন পাল্টে গেছে। কেমন ঝিমিয়ে পড়া ভাব। মণ্টুর কাছে কিছু শুনল, নবতারার কাছে বাকিটা। কাজলের বিছানার পাশে গিয়ে বসল। কাজল জ্বরে অচেতন। সারা রাত বরফ দেওয়ার ফলে ভিজে চুলের রাশ।

কিছুক্ষণ বসেই অরবিন্দ উঠে দাঁড়াল।

নবতারার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোন ডাক্তার দেখছেন বললেন?

মোড়ের ডাক্তার গাঙ্গুলী, নতুন বসেছে এ পাড়ায়।

আমি যদি কোন ডাক্তার আনি তা হলে কি আপত্তি আছে আপনাদের?

না, না, আপত্তি আর কি! অসুখ যদি কঠিন হয় তো বড় ডাক্তার আনাই তো ভাল। কিন্তু বড় ডাক্তার মানেই তো মোটা টাকা। এমনিতে একদিনেই ওষুধপত্রে, ডাক্তারের দর্শনী বাবদ মন্দ যায় নি। এখনও কাজলের হাতব্যাগ আর ড্রয়ার হাতড়াবার অবকাশ পান নি নবতারা। কিন্তু এসব কথা তো আর অনাত্মীয় কারুর কাছে বলা যায় না। যদি দরকার হয়, বড় ডাক্তার আনতে হবে বৈকি! সোনাদানা যা কিছু ঘরে আছে, সব খুইয়ে।

অরবিন্দ আর দাঁড়াল না। তীরবেগে নেমে গেল।

ঘণ্টাখানেক, তার মধ্যেই মোটর এসে দাঁড়াল।

জানলার ফাঁক দিয়ে নবতারা দেখল অরবিন্দর পিছন পিছন ভারিক্কি চেহারার একটি ভদ্রলোক নামলেন। সঙ্গে মোড়ের ডাক্তারও রয়েছেন। অরবিন্দ আসবার পথে তাঁকে তুলে নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার রুদ্র। নামজাদা ডাক্তার। প্রৌঢ়, অভিজ্ঞ লোক। লোকে বলে ধন্বন্তরি। যেমন পসার, তেমনি হাতযশ। কৌলীন্য যেমন, দক্ষিণাও তথৈবচ। বত্রিশের কমে রোগী ছোঁন না। অনেকক্ষণ ধরে তিনি কাজলকে দেখলেন। দেখা শেষ করে মোড়ের ডাক্তার আর অরবিন্দকে জানলার কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাপাগলায় পরামর্শ করলেন, তারপর সকলে মিলে নিচে নেমে গেলেন।

বাণীর পরীক্ষার ফি আলাদা করা ছিল, মুঠোর মধ্যে তাই নিয়ে নবতারা অপেক্ষা করল। এ ডাক্তারের ভিজিট কত, তা তার জানা নেই। বাণীর কাছেই শুনেছিল বত্রিশ টাকা। বাণী শুনেছে ক্লাসের মেয়েদের কাছে।

অরবিন্দ ওপরে উঠে আসতেই নবতারা টাকা ক'টা তার দিকে এগিয়ে দিল।

কি ?

ওই ডাক্তারের ফি। ঠিক কত তাতো জানি না। বাণী বলছিল, বত্রিশ।

ঠিক আছে, এখন রেখে দিন। ডাক্তার রুদ্র আমাদের বাড়ির ডাক্তার। পরে একসঙ্গে দিলেই হবে।

আরো তো অনেক খরচ আছে বাবা, টাকা ক'টা তুমি রেখে দাও। অরবিন্দ ঘাড় নাড়ল, টাকা এখন থাক। দরকার হলে আমি চেয়ে নেব।

ডাক্তার কি বললেন বাবা ? নবতারা এত কথা অরবিন্দর সঙ্গে

বলে না, কিন্তু আজ আর তার মাথার ঠিক নেই। ঘরের মটকায় আগুন লাগলে তখন আর মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আজ নবতারার অবস্থা তার চেয়েও ভয়ানক। কাজল বিছানায় শুয়ে থাকা মানে গোটা সংসার অচল হয়ে যাওয়া।

অত্যধিক পরিশ্রম আর চিন্তায় কাজলদির এই অবস্থা হয়েছে। ভয়ের খুব কারণ নেই কিন্তু সারতে হয়তো সময় নেবে। সারলেও বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। খাটুনি একেবারে বারণ।

নবতারা আর কথা বাড়াল না। অরবিন্দর পিছন পিছন কাজলের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অরবিন্দ কাজলের মাথার কাছে বসে বলল, আপনার ঝিকে দিয়ে কিছু বরফ আনিয়ে নিতে হবে। ডাক্তার রুদ্র বললেন, বরফটা যেন বন্ধ করা না হয়।

কথার শেষে অরবিন্দ উঠে দাঁড়াল, মণ্টুকে ডেকে বলল, মণ্টু একটা কাজ করতে হবে ভাই।

মণ্টু চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়েছিল, অরবিন্দর ডাকে তার কাছে এগিয়ে গেল।

মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে দুটো ওষুধ আনতে হবে। এতক্ষণে বোধ হয় তৈরি হয়ে গেছে। পারবে না আনতে?

ঘাড় নেড়ে মণ্টু বাইরে চলে গেল।

বেলা বারোটা নাগাদ অরবিন্দ উঠে দাঁড়াল। নবতারাকে বলল, আমি কিছুক্ষণের জন্য একবার বাড়িতে ঘুরে আসি। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার আসব।

খেতে বাড়িতে যাবে কেন বাবা। এখানেই শাকভাত যা হয়েছে মুখে দিয়ে নাও না।

শুধু খাওয়ার কথা নয় মা। সেই সাত সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। না গেলে বাড়ির লোকও ভাবতে আরম্ভ করবে।

এরপর আর ওজর চলে না। নবতারা অরবিন্দর পিছন পিছন

সিঁড়ির কাছ অবধি গিয়ে দাঁড়াল। অরবিন্দ সিঁড়িতে পা দিতেই ফিসফিসিয়ে বলল, তোমার কাছে কোন লুকোচুরি নেই অরবিন্দ। সবই তো তোমার জানা। বাড়িতে লোক বলতে এই আমরা কটি মেয়েমানুষ। সহজ অবস্থায় তবু একরকম। বিপদের মুখে আমাদের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ ? কাজলই এ সংসারের মাথা। বিপদে আপদে আমরা ওর দিকেই চেয়েছি। ও বিছানা নিলে আমাদের নির্ভর করার মতন আর কেউ থাকে না।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাজলদি সেরে উঠবেন। যতদিন না সেরে ওঠেন, আমি তো রইলাম, আমাকে বাড়ির ছেলের মতনই মনে করবেন।

তোমাকে বাড়ির ছেলের মতন মনে না করলে এ ভাবে তোমার কাছে সব কথা বলতাম না অরবিন্দ। এ ভাবে নিজে এসে দাঁড়াতাম না।

কথার সঙ্গে সঙ্গে নবতারা আঁচল দিয়ে হু'চোখ চাপা দিল।

অরবিন্দ যখন ফিরল, প্রায় বিকেল।

মেয়ের ঘরের মেঝেতে আঁচল পেতে নবতারা শুয়েছিল। বাণী বরফের ব্যাগ ধরে বসেছিল কাজলের শিয়রে। সিঁড়িতে অনেক-গুলো শব্দ হতে হুজনেই ধড় মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

অরবিন্দ একলা নয়, সঙ্গে ডাক্তার গাঙ্গুলী আর দিলীপ।

অরবিন্দ নবতারার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আমার একটু দেরী হয়ে গেল। ভাবলাম দিলীপদাকে একবার খবর দেওয়া দরকার। দিলীপদা বাসায় ছিলেন না। ওঁর জন্য অপেক্ষা করতেই দেরী হয়ে গেল।

নবতারা কিছু বলল না। অন্য সময় দিলীপের আসাটা হয় তো খুব প্রীতির চোখে দেখত না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এমন অবস্থায় পুরুষ মানুষ যত আসে, ততই যেন ভাল। নবতারা আর কি বোঝেন, কতটুকু ! নিজের লোক তিনকূলে কেউ নেই। এরাই তো ভরসা। দিলীপবাবু, অরবিন্দ।

সারা দুপুর বরফ দেওয়া হয়েছে তো?

নবতারা ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, সারাক্ষণ বাণী বরফ দিয়েছে। একটু থেমে আবার বলল, দুপুরের দিকে কাজল একবার চোখ চেয়েছিল।

কাজলদি চোখ চেয়েছিলেন?

হ্যাঁ, কিন্তু সে সহজ মানুষের চাউনি নয়। ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক ওদিক কি দেখল, তারপর ঠোঁট কুঁচকে আবার চোখ বুজল!

কথার শেষে নবতারা নিশ্বাস ফেলল।

অরবিন্দ কাজলের ঘরে ঢুকে দেখল, ডাক্তার গাঙ্গুলী পরীক্ষা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

অরবিন্দকে ঢুকতে দেখে বললেন, ডাক্তার রুদ্রকে টেলিফোন করে রিপোর্টটা একবার দিতে হবে।

কেমন দেখলেন?

এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা সম্ভব নয়। হার্টের অবস্থা আগের চেয়ে সামান্য ভাল।

দিলীপ কাজলের মাথার কাছে বসেছিল, বাণীর পাশাপাশি। ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলল, পরশু রাত্রে আমরা দেখে গেছি সহজ মানুষ। এর মধ্যে এতটা বাড়াবাড়ি হল?

ডাক্তার গাঙ্গুলী হাসলেন, ভিতরে ভিতরে ভাঙন চলছিল অনেক আগে থেকেই। সহ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করছিলেন বোধ হয়। আমি নিজেই তো ডিসপেনসারী থেকে এঁকে সকাল সন্ধ্যা দৌড়াদৌড়ি করতে দেখছি। প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে একটা কথা আছে জানেন তো? তাছাড়া হঠাৎ বোধ হয় একটা Mental Shock পেয়েছেন।

Mental Shock?

হ্যা, তাই মনে হচ্ছে। এ শুধু আমার কথা নয়, ডাক্তার রুদ্রেরও তাই মত।

কিন্তু সে রকম মানসিক আঘাত পেয়েছেন বলে তো জানি না। দিলীপ বিড়বিড় করে বলল।

মানুষের মনের রহস্যের কথা আমরা আর কতটুকু জানি বলুন। তাছাড়া একটা মধ্যবিত্ত মেয়ের জীবনে সংঘাত কত দিক থেকে আসতে পারে, কত ভাবে।

দিলীপ আর কথা বলল না। চুপ করে বসে রইল। চোখের সামনে থেকে যেন অন্ধকার সরে যাচ্ছে। চেতনার আলোয় একটু একটু করে সব কিছু পরিস্কার হয়ে আসছে। ফুটে উঠছে মানসিক আঘাতের স্বরূপ।

এক সময়ে সকলের চোখ বাঁচিয়ে দিলীপ জানলার তাকের দিকে চোখ ফেরাল। শুকনো মালার চিহ্নমাত্রও নেই। নটরাজের মূর্তিটাও কাজলের পুরানো শাড়ি দিয়ে ঢাকা।

সন্ধ্যার ঝোঁকে দিলীপ উঠে দাঁড়াল।

অরবিন্দকে ডেকে বলল, আমি চলি আজকে। রাত্রে কতকগুলো ভদ্রলোকের আসার কথা আছে। কালকের বক্তৃতার বিষয় আলোচনা করতে। তুমি কাল সকাল নাগাদ একবার খবরটা দিও। বুঝলে?

অরবিন্দ ঘাড় নেড়ে দিলীপের পিছন পিছন এল।

সিঁড়িতে পা দিবার মুখে দিলীপ ঘুরে দাঁড়াল, তুমি তো রাত্রে এখানেই থাকবে?

এখানে একজনের থাকা দরকার, তাই নয় দিলীপদা? একেবারে তো মেয়েছেলের সংসার।

হাঁ, তোমার থাকা দরকার। আরো একটা কথা, এখন আমি সঙ্গে টাকা আনি নি, তুমি কিছু টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে এস কাল।

টাকার এখন বিশেষ দরকার হবে না দিলীপদা। দাদার কাছ থেকেই যা দরকার নিচ্ছি। কাজলদির মাইনে থেকে শোধ করে দিলেই চলবে। কাজলদিকে তো চেনেন, সেরে উঠে যদি শোনেন,

অসুখের সময় আমরা টাকা দিয়েছি শুধু হাতে, তা হলে আপনি হয়তো পার পেয়ে যাবেন, কিন্তু আমার কোন দিন মুখদর্শন করবেন না।

দিলীপ ম্লান হেসে চলে গেল।

কাজল চোখ মেলল প্রায় দশ দিন পরে।

মধ্যে দুদিন অবস্থা খুব খারাপের দিকে। ডাক্তার রুদ্রকে আসতে হয়েছিল। সারারাত সবাই মাথার কাছে বসে। নবতারা ছাড়া। পাশের ঘরে মেঝের ওপর শুয়ে শুধু গুমরে গুমরে কেঁদেছিল। অনেক বুঝিয়েও অরবিন্দ তাকে শান্ত করতে পারে নি।

দিলীপ নেই। তার থাকার উপায় ছিল না। যাবার দিন প্রায় সারাটা সকাল কাজলের কাছে কাটিয়ে গেল।

অরবিন্দকে বলল, আমার তো আর থাকবার উপায় নেই অরবিন্দ। এমনিতেই তিন দিন দেরী হয়ে গেল। তুমি মাঝে মাঝে সম্ভব হলে চিঠি লিখে খবরটা জানিও।

প্রথম চোখ মেলেই কাজল নবতারাকে খুঁজল।

আস্তে ডাকল, মা!

নবতারা রান্নাঘরে ছিল। বাণী তাকে ডেকে নিয়ে এল এ ঘরে।

মেয়ের মুখের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে নবতারা উত্তর দিল, কি মা! কেমন আছ এখন?

কাজল আবার বলল, মা! তারপর চোখ বুজল।

সেইদিনই অরবিন্দ দিলীপকে একখানা চিঠি লিখল। এর আগে আর একখানা চিঠি দিয়েছিল, কাজলের বাড়াবাড়ির খবর দিয়ে। এবার লিখল, কাজল ভাল আছে। ডাক্তার রুদ্র বলেছেন আর ভয়ের কিছু নেই।

বিকেলের দিকে নবতারা অরবিন্দকে পাশের ঘরে ডাকল।

তোমার ঋণ বাবা জীবনে শোধ করতে পারব না। শুধু তোমার জন্যই কাজলকে ফিরে পেলাম।

অরবিন্দ হাসল, এই কথা বলবার জন্য ডেকে পাঠালেন? বেশ তো, কাজলদি ভাল করে সেরে উঠুন। আর একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দেবেন।

শুধু সে কথা নয় বাবা, আজ পর্যন্ত কত তুমি খরচ করলে জানতে পারলাম না। ডাক্তার, পথ্য সব খরচ তুমি করেছ। কাজল সেরে উঠলে প্রথমে আমাকে সেই কথাই বলবে। নগদ টাকা পয়সা আমার কিছুই নেই, তাতো জান। কেবল এই সম্বল আছে বাবা। ঋণ শোধের অন্য উপায় আমার নেই।

মুঠোর মধ্যে একজোড়া বালা নিয়ে নবতারা হাতটা এগিয়ে দিল।

এ আপনি কি করছেন, অরবিন্দ ছু পা পিছিয়ে গেল, টাকা আমি দিই নি। কাজলদির কলেজ থেকে যোগাড় হয়েছে। মাস মাস মাইনে থেকে কাটা হবে। সে সবের জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না।

কিন্তু দিলীপবাবু দেন নি কিছু?

দিতে চেয়েছিলেন, আমি নিই নি, কারণ প্রয়োজন হয় নি। আপনি অযথা ভাববেন না এসব নিয়ে। কাজলদি সেরে উঠেছেন এইটেই বড় কথা। ক'টা টাকা কি ভাবে শোধ হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

নবতারা আর কিছু বলল না। বালা ছুটো আঁচলে বেঁধে নিল।

কাজল বিছানা ছেড়ে উঠল দিন পঁচিশেক পর।

শেষদিকে নবতারার মুখে সবই শুনেছিল। অরবিন্দর প্রাণপাত পরিশ্রমের কথা। ডাক্তার রুদ্রের আসা যাওয়া, অসুখের মধ্যে একবার মনোজবাবু আর কলেজের অন্য ছু'একজন অধ্যাপিকার দেখা করতে আসার কাহিনী। কেবল দিলীপের দেখতে আসা, সেবা করার কথাটা কি ভেবে নবতারা বলল না। কাজলও জিজ্ঞাসা করতে পারল না মুখ ফুটে।

বিকেলেই অরবিন্দ এসে হাজির। কাজল একটু সেরে ওঠার

পর অরবিন্দ তিন চার দিন অন্তর আসে। উঁকি দিয়ে কাজলকে দেখে সরে যায়। বেশী কথা বলা ডাক্তারের বারণ।

আজ কাজলকে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অরবিন্দ এ ঘরে ঢুকল।

এই তো। উঠে দাঁড়িয়েছেন?

সে কৃতিত্ব তো তোমার অরবিন্দ। মাথা তুলে অবধি কেবল তোমার প্রশংসা শুনছি।

বটে। বলুন একটু শুনি। বহুদিন প্রশংসা শুনি নি।

কাজল হাসল, খুব একটা কাণ্ডই করে তুলেছিলাম, না?

তা মন্দ নয়, প্রায় লঙ্কাকাণ্ডের সামিল।

যাক, এই সুযোগে খুব তোমার সেবা খেয়ে নিলাম তো?

শুধু আমার?

তবে আর কার?

বাড়ির সব লোকের, তাছাড়া দিলীপদা নিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথার কাছে বসে বরফ দিয়েছেন।

দিলীপদা! পাংশুমুখে রক্তের সঞ্চার। কাজল জানলার কবাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

হাঁ, দিলীপদা এসেছিলেন। বেশীদিন থাকতে পারবেন না, সে দুঃখও করলেন। পৌঁছে চিঠি দিয়ে খোঁজ নিয়েছিলেন। আমিও উত্তর দিয়েছি। এবার আপনার সম্পূর্ণ সেরে ওঠার খবরটা আপনি নিজের হাতেই দিন কাজলদি। দিলীপদা খুশি হবেন।

খুব সাবধানে দেয়াল ধরে ধরে কাজল বিছনায় ফিরে এল।

অনেকক্ষণ পরে কাজল কথা বলল, টিউশনি দুটো নেই জানি। কলেজের চাকরিটা আছে তো অরবিন্দ?

আছে বোধ হয়, অরবিন্দ হাসল, দাদা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দেখতে এসেছিলেন একদিন।

বল কি? কাজল অবাক। একটু থেমে বলল, বড় সব ডাক্তার এনে রাজকীয় চিকিৎসার আয়োজন করেছ শুনলাম। মার গায়ে যা

সোনাদানা আছে তাতে কুলিয়ে ওঠার কথা নয়। বাণীর তো সোনার পাত মোড়া কাচের চুড়ি সম্বল। কুড়িয়ে বাড়িয়ে বাড়িতে যা পাওয়া যাবে তাতো বরফেই খরচ হয়ে যাবার কথা। গৌরীসেনটি কে ?

এমন একটা প্রশ্নের জন্য অরবিন্দ তৈরি ছিল। কাজলকে সে খুব চেনে। সেরে উঠেই যে একথা জিজ্ঞাসা করবে সে আভাস নবতারা আগেই দিয়েছে। তাই কাজলের প্রশ্ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, গৌরীসেন দু'একজন এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমরা পাত্তা দিই নি।

বটে। কাজল তাকিয়া ঠেস দিয়ে ভাল হয়ে বসল।

হাঁ, শেষ পর্যন্ত সবাইকে সরিয়ে দিয়ে আপনার নামেই ধার নিয়েছি।

আমার নামে ? নাম করলেই ধার পাওয়া যায়, বাজারে আমার এত বড় ক্রে-ডিড তাতো জানতাম না !

নিজের বিষয়ে আমরা আর কতটুকু জানি। অরবিন্দর গলায় দার্শনিকের সুর।

বল না অরবিন্দ ধারটা দিলে কে ?

কলেজ ফাণ্ড থেকে ধার নিয়েছি। দাদাই বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। মাস মাস মাইনে থেকে আপনি শোধ দেবেন।

কাজল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, বাঁচালে ভাই। অন্য কেউ দয়া করেছে শুনলে বিছানা ছেড়ে উঠতাম না। আবার হয়তো শক্ত অসুখে পড়তাম। মানুষের বিরাগ, আক্রোশ, অবজ্ঞা, সব সইতে পারি কিন্তু তাদের দয়া আর দাক্ষিণ্য ধাতে সয় না। কারুর অনুকম্পায় দেহে হয়তো বাঁচতাম কিন্তু মনে অর্ধমৃত হয়ে থাকতে হত সারাটা জীবন।

অরবিন্দ চলে যেতে কাজলের কথাটা মনে পড়ে গেল। এদিকটা সে ভেবেও দেখে নি। কলেজের তো টলমলে অবস্থা। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তার আবার ফাণ্ড। সেই ফাণ্ড থেকে আবার অসুস্থ অধ্যাপিকাকে সাহায্য দান।

এ নিয়ে আর বেশী চিন্তা করল না কাজল। যে-ই দিক, যে উপলক্ষ্য করেই সাহায্য করে থাকুক, মাথা পেতে সে দান তো গ্রহণ করতে হবে না কাজলকে। দান তো নয় ঋণ। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিটি পাই কাজল শোধ করে দেবে।

বাইরে বেরোতে কাজলের প্রায় মাসখানেক লাগল।

ভাগ্য ভাল। একটা টিউশনিও গেল না। একজন খোঁজ করে কাজলের অসুস্থতার খবর জেনেছিল, অন্যজন কাজলের মুখেই শুনল। অবশ্য মুখ ফুটে কিছু না বললেও চলত। কাজলের চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যায় কি রকম শক্ত অসুখ থেকে সে উঠেছে।

ইতিমধ্যে দিলীপকে একটা চিঠি দিয়েছিল। খামে নয় কার্ডে। কি জানি খামে চিঠি দিতে তার ভরসা হয় নি। খামে অনেক কথা লেখা যায়। সঙ্গোপনে উজাড় করে দেওয়া যায় নিজেকে কার্ডের স্বল্প পরিসরে নিজেকে সঙ্কুচিত করে আনতে হয়। মন খুলে সব কথা বলা যায় না।

খুব অল্প কয়েক লাইন লিখল। সেরে উঠেছে, তবে শরীর এখনও দুর্বল। রোগশয্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যারা সেবা করেছিলেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

শেষদিকে দিলীপের শরীর গতিকের খবর জিজ্ঞাসা করেছে। তার গবেষণার কথা।

অরবিন্দর সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়। কোনদিন ঘরের চৌকাঠের কাছ বরাবর, কোনদিন গলির মোড়ে।

বাণীর পরীক্ষা সামনে। কাজলের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় না, তাই নবতারার বিশেষ অনুরোধে অরবিন্দ ঘণ্টা খানেকের জন্য বাণীকে পড়িয়ে যায়। ফাউ হিসেবে মণ্টু গিয়ে বসে। পড়ার তাগিদে ততটা নয়, যতটা অরবিন্দর কাছে গল্প শোনার ছুতোয়।

মাঝে মাঝে কাজল বাণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, কিরে পড়া-শোনা কেমন হচ্ছে?

এমনিতেই বাণী কম কথা বলে। দিদির প্রশ্নে মাথাটা হেঁট করে আস্তে আস্তে, বলে, ভাল।

ফার্ষ্ট ডিভিশন হবে তো ?

বাণী একদৃষ্টে কাজলের দিকে চেয়ে থাকে, কোন উত্তর দেয় না।

কাজল অরবিন্দর কাছেও মাঝে মাঝে খোঁজ নেয়, অরবিন্দ তোমার ছাত্রীর খবর কি ? পাশ করতে পারবে তো ?

দোহাই কাজলদি, ওরকম নার্ভাস করে দেবেন না। টিউশনিতে এই আমার প্রথম হাতে খড়ি। বাণী ভাল করে পাশ করলে, তবে অন্য জায়গায় পড়াবার ডাক আসবে।

না, না, ঠাট্টা নয় অরবিন্দ, বাণী কেমন পড়াশোনা করছে ?

পড়াশোনায় খারাপ নয়, কিন্তু বড্ড ভীতু। একটু জোরে প্রশ্ন করলেই চোখমুখ ছলছল করে ওঠে। দারুণ ঘাবড়ে যায়। সেই আমার একমাত্র ভয়।

আমিও ওর বয়সে ঠিক ওই রকমই ছিলাম অরবিন্দ। পরীক্ষার হলে ঢোকার আগের মূহূর্ত পর্যন্ত ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম। অবশ্য প্রশ্নপত্র হাতে এলে বুকে বল আসত। ভয় ডর কোথায় উড়ে যেত।

তা যদি হয়, তাহলে ভয়ের কিছু নেই কাজলদি। বাণী ভালভাবেই পাশ করে যাবে। ইতিহাসে খুব মাথা। দিদির নাম রাখবে।

তাহলে তোমার পক্ষে তো সেটা খুব গৌরবের হবে না মাস্টার মশাই।

কেন ?

বা, পড়াবে তুমি আর নাম রাখবে আমার, তাহলে আর তোমার কৃতিত্বটা কোথায় !

আমার নাম রাখতে গেলে যে ওরই বিপদ। গেজেটে কোথাও নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অরবিন্দ প্রসঙ্গ পালটাল, দিলীপদাকে চিঠি লিখে দিয়েছেন কাজলদি ?

কাজল খাদে নামাল গলার স্বর, না ভাই অনেকদিন আগে একটা লিখেছিলাম। আর একটা এখনও লিখে উঠতে পারি নি।

সে কি, আপনি লিখবেন বলে আমিও যে লিখছি না।

দেখি, আজ রাত্রেই লিখব।

সত্যিই টিউশনি সেরে এসে কাজল সে রাত্রেই লিখতে বসল। একটা পোস্টকার্ড বের করল প্রথমে তারপর কি-ভেবে চিঠির কাগজ সামনে নিল। লিখল বড় জোর লাইন দশেক কিন্তু ভাবল এক ঘণ্টারও বেশী। দিলীপ এখান থেকে বহুদূরে, কিন্তু মানুষের মনের কাছে এ দূরত্ব আর কতটুকু!

সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে কাজলের মনে হল দিলীপের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এক রাশ মূর্তি চারপাশে, এখানে ওখানে ছড়ানো কাগজের গোছা। মোটা মোটা বই। জ্ঞান নেই মানুষটার। এক মনে কাজ করে চলেছে।

এই দেখ কাজল, এ মূর্তিটা পেয়েছি ভিলওয়ারার কাছে একটা শুকনো কুয়োর তলা থেকে। মূর্তির ভঙ্গীটা লক্ষ্য কর। চোখ আর হাত পায়ের গড়ন। পারস্যের প্রভাব কতখানি দেখেছ? তারপর এই দেখ, পূরো মূর্তিটা পাওয়া যায় নি। বুন্দির এক টাঙ্গাওয়ালার সাহায্যে এটি উদ্ধার করেছি। মাথা নেই, ডান হাত নেই, শুধু শরীরের কাঠামো। অপ্সরা মূর্তি বলেই যেন মনে হচ্ছে। ভাল করে ধুতে হবে এটাকে। অলঙ্কারের গড়ন দেখে এর জাত আর বয়স বের করতে হবে।

মূর্তিতত্ত্বের দামী দামী সব কথা। কিন্তু সেদিকে কাজলের একটুও মন নেই। কেবল চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে দিলীপ কোথায় রেখেছে সেই শুকনো ফুলের রাশ। এ সব অতীতকালের মূর্তির চেয়ে তার দাম কাজলের কাছে অনেক বেশী। এতো শুধু অতীত কিন্তু সে শুকনো ফুলের গুঁড়ো ওর বর্তমান, ওর ভবিষ্যতের সম্বল।

চিঠিতে অবশ্য কাজল এ সব কিছুই লিখল না। মামুলী কথা।

কাজলের সেবা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। কেবল শেষদিকে একটা লাইন লিখল। আবার কবে আসবে দিলীপ? আবার কবে দেখা হবে?

বাণীর পরীক্ষা শেষ। জিজ্ঞাসা করে যেটুকু জানা গেল তাতে মনে হল ভালই দিয়েছে। অরবিন্দ কিছু বলল না। কাজলের উত্তরে মাথা চুলকাল, রেজাল্ট বেরবার আগে কিছু বলতে পারব না কাজলদি। এসব ভাবছিও না। আপনার মার ফরমাস, বাণীর ছুটির মধ্যে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় আর জৈন মন্দিরে নিয়ে যেতে হবে।

বেশ আছ অরবিন্দ! তোমার রিসার্চ?

ভাবছি কলকাতার মন্দিরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু লিখব। কাজেই এ বেড়ানোটায় আমার খুব উপকার হবে কাজলদি। স্ট্যাডি ট্যুরও বলতে পারেন।

কাজল মুচকি হাসল। বলল, দল থেকে আমায় বাদ দিলে কেন?

আপনি যাবেন কাজলদি? উৎসাহে অরবিন্দ দাঁড়িয়ে উঠল।

আমার ছাত্রীদের পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি অরবিন্দ। এ সময় আমি মন্দির দেখে বেড়ালে তারা চোখে অন্ধকার দেখবে।

অরবিন্দ মুখ কোঁচকাল, আপনি যাবেন না জানি। এ সময়টা বরং বেনাভোলেণ্ট ডেস্‌পোটিজম্ সম্বন্ধে দশ পাতা নোট লিখবেন কিংবা কণিষ্কের রাজ্যশাসন প্রণালীর খসড়া।

হেসে কাজল সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সেদিন ছাত্রীর বাড়ির দরজার কাছে গিয়েই কাজল থমকে দাঁড়াল। দরজায় তালা। বাড়িতে কেউ নেই। আশ্চর্য, আজ বাদে কাল পরীক্ষা। অথচ গেল কোথায়!

একটু নিচু হতেই নজরে পড়ল। দরজার কড়ার মধ্যে একটা কাগজ আটকান। কাজল কাগজটা তুলে নিয়ে রাস্তায় এসে

দাঁড়াল। ল্যাম্পপোস্টের নিচে গিয়ে কাগজটা খুলল। দু' লাইন চিঠি। ছাত্রী লিখেছে। কে এক আত্মীয়া কলকাতায় এসেছেন মেয়ের বিয়ে দিতে। তার সঙ্গে দেখা করতে বাড়ির সবাই শ্যাম-বাজারে যাচ্ছে। একটা সন্ধ্যা ছুটি চায়।

কাজল একটু দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে পা চালাল। ভালই হয়েছে। খুব ক্লান্ত লাগছে শরীর। এ সময় একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভালই লাগবে।

বাড়ির কাছ বরাবর গিয়েই এক বিপর্যয়। স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেল। কি ভাগ্যিস বাড়ির কাছে। নয়তো কেলেঙ্কারী হত। আঁচলের মধ্যে চটি লুকিয়ে বাড়ি ফিরতে হত।

চটিজোড়া হাতে নিয়ে কাজল ওপরে উঠল। সিঁড়ির চাতালে উঠেই থেমে গেল। ফিসফাস চাপা গলার শব্দ।

পা টিপে টিপে কাজল এগিয়ে গেল। বাণীর ঘরের দরজায় একবার উঁকি দিয়েই সরে এল।

সন্তর্পণে পা ফেলে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। হাতব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বিছানার ওপর বসে পড়ল। সর্বাঙ্গ কাঁপছে। দু'কানে আগুনের হল্‌কা। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারল না। আবছা অন্ধকারে ভুল দেখেনি তো কাজল!

নিজের মনকে ভোলাবার মিথ্যা চেষ্টা। একটুও ভুল দেখেনি কাজল। এত কাছ থেকে নিজের লোককে চিনতে কেউ ভুল করে না।

বাণীর দুটো হাত অরবিন্দর একটা হাতের মধ্যে, আর একটা হাতে অরবিন্দ কাছে টেনে এনেছে তাকে।

বাণীর খোঁপা ভেঙে পড়েছে পিঠের ওপর। পরম নির্ভরতায় মাথাটা রেখেছে অরবিন্দর বুকে।

অরবিন্দ চাপা গলায় কি সব বলছে। কি বলছে শুনতে না পেলেও বুঝতে কাজলের একটুও অসুবিধা হল না। এমন পরিবেশে, বুকের ওপর লুটিয়ে পড়া মেয়েকে, পুরুষ এক ধরণের কথাই বলে।

যুগ যুগ ধরে আদিম মানব মানবীকে যা বলে এসেছে তারই পুনরাবৃত্তি।

অনেক বছর আগে ট্যাক্সির মধ্যে নিজের কাছে টেনে এনে দিলীপ একই কথা বলেছিল। কিন্তু অরবিন্দ আর বাণী। সংসারের সামান্য অভিজ্ঞতাও নেই, এমন দুজনের এ প্রণয় কাকলির কি দাম!

কাজল সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

নবতারা তরকারী চাপিয়ে উনানে বাতাস করছিল, কাজল তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, মা, বাড়িতে এসব কাণ্ড হচ্ছে, দুটো চোখের মাথা বুঝি খেয়েছো তুমি?

কাজলের গলার শব্দ কানে যেতেই নবতারার হাত থেকে পাখা মেঝেয় পড়ে গেল। ঘুরে বলল, কি, কি হয়েছে রে কাজল?

কি হয়েছে নিজের চোখে দেখে এস। তোমার মেয়ের কীর্তি দেখ ভাল করে।

নবতারা দাঁড়িয়ে পড়ল, কি, বাণীর কি হয়েছে?

কি হয়েছে তুমিই ভাল বলতে পারবে মা। আমি বিকেলে বাড়ি থাকি না। আজ ফিরতেই চোখে পড়ল।

কি দেখলি বলবি তো? নবতারা চাপা গলা একটু চড়া করল।

তোমার মেয়ে আর অরবিন্দ, কাজল থেমে গেল, আমি এর বেশী আর বলতে পারব না মা।

নবতারা কাজলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গলায় আঁচল দিল। দু'হাত জোড় করে কার উদ্দেশে প্রণাম করল, তারপর কাজলের দিকে ফিরে একগাল হেসে বলল, ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন কাজল। এ যে আমার অনেক দিনের সাধ।

কাজল অবাক চোখে অনেকক্ষণ মার দিকে চেয়ে রইল। তখন নিজের চোখকে বিশ্বাস হয়নি, এখন অবিশ্বাস জন্মাল নিজের কানের ওপর। ঠিক শুনছে তো কাজল!

একটু একটু করে অস্পষ্টতা কেটে গেল। এই জন্যই বুঝি

অরবিন্দকে নিমন্ত্রণ করার এত ঘটা! বাণীকে পড়ানোর জন্য অনু-রোধ। চোখ থাকতেও কাজল কানা।

এর পরিণাম কি জানো মা?

কি আবার পরিণাম। পাল্টা ঘর। ছেলেটিও দিব্যি। অর-বিন্দর কাছে আমি সব খোঁজ নিয়েছি।

কিন্তু অরবিন্দ যদি বিয়ে না করে তোমার মেয়েকে?

পাগল নাকি! অরবিন্দ তেমন ছেলেই নয়।

কাজল আর কথা বলল না। নবতারার সঙ্গে কথা বলেও লাভ নেই। তুনিয়ার হালচাল কিছুই জানে না। ধারণা, পৃথিবী একটা সহজ সরল রেখা, মানুষগুলো সদাচারী। এ ভাবে মেলামেশার বিষময় ফলের কথা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে না। হৃদয়-দেওয়া-নেওয়া খেলায় উঠতি বয়সের একটা মেয়ের কতখানি সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে, সে সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কাজল রান্নাঘর থেকে বেরোতেই দরজার কাছে অরবিন্দর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা।

অরবিন্দ কিছু বলবার আগেই কাজলই কথা বলল।

একটু এ ঘরে এস অরবিন্দ, কথা আছে। গম্ভীর গলার স্বর। সামান্য কম্পনের আভাস।

কাজলের পিছন পিছন অরবিন্দ কাজলের ঘরে এসে ঢুকল। কোনরকম ভূমিকা না করেই কাজল বলল, একটু আগে তোমাকে আর বাণীকে যে অবস্থায় দেখেছি, তার একটা মানেই হয়। তুমি ছেলেমানুষ নও অরবিন্দ, অশিক্ষিতও নও। এভাবে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করার কি মানে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?

তু'এক মিনিট অরবিন্দ মাথা নিচু করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, খোলাখুলিভাবে এ কথাটা আমায় জিজ্ঞাসা করে ভালই করেছেন কাজলদি। আপনি না বললেও কথাটা আমি আপনাদের কাছে পাড়তাম।

কাজল কোন কথা বলল না। ভ্রূ দুটো কুঁচকে একদৃষ্টে অরবিন্দর দিকে চেয়ে রইল।

অরবিন্দ ঢোক গিলল। একটা পা দিয়ে মেঝেটা ঘসল, তারপর গলা চড়িয়ে বলল, বাণীকে আমি বিয়ে করব কাজলদি!

খুব আস্তে কাজল বলল, তারপর?

আপনি হয়তো আমার যোগ্যতার প্রশ্ন তুলবেন। যোগ্যতা আমার কণামাত্রও নেই। যেটুকু জোর সেটুকু শুধু আপনাদের স্নেহের দাবীতে। চাকরি একটা পেয়েছি। সামনের মাস থেকেই কাজে লাগব। আপনাকে লজ্জায় বলিনি, একটা পরীক্ষা দিয়েছিলাম, আশ্চর্যের কথা পাশও করেছি। সরকারী চাকরি। ইতিহাসের গবেষণা বিভাগে। এ ছাড়া দাদাও সেদিন বাণীকে দেখে গেছেন। বৌদির অমত হবে না, তা আমি জানি। কথাবার্তায় যেটুকু মনে হয়েছে তাতে আপনার মাও হয়তো আপত্তি করবেন না। আমার ভয় কেবল আপনাকে।

আমাকে? অরবিন্দর কথা বলার ধরণে গাম্ভীর্যের প্রলেপ ফিকে হয়ে এল কাজলের। দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসি চাপল। বলল, আমাকে ভয় কেন অরবিন্দ?

কি জানি কাজলদি। মনে হয়েছে এ ব্যাপার আপনাদের পরিবারে আর বুঝি আপনি ঘটতে দেবেন না।

কাজলের শরীর অল্প কেঁপে উঠল। কথা বলার বৃথা চেষ্টা। ঠোঁট দুটো কেবল নড়ে উঠল। তার জীবনের কিছুটা যে অরবিন্দ জানে, সেটা কাজল আগেই বুঝেছিল। কিন্তু কতটুকু জানে। কোন্ অধ্যায়। হাবে ভাবে এটুকু সে বুঝিয়েছে অনেক আগে। ছুতো করে বার বার কাজলকে একলা থাকার সুযোগ দিয়েছে দিলীপের কাছে। সময়ে অসময়ে দিলীপের কথা বলেছে, কিন্তু কাজলের হৃদয় গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার মর্মন্তুদ কাহিনীও কি অজানা নেই অরবিন্দর! নিশ্চয় তাই, নয়তো আজকের এ কথার আর কি মানে হতে পারে। খুব স্পষ্ট করেই তো

অরবিন্দ বলল, অস্বচ্ছ কুয়াশা কোথাও নেই, কোন আবরণ নয়।

আচমকা খেয়াল হল কাজলের, পা ছুঁয়ে অরবিন্দ তাকে প্রণাম করছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে কাজল শুনতে পেল, পাশের ঘরে নবতারা আর বাণী কথা বলছে।

খুব চাপা গলায়। হয়তো কাজলের কথাই আলোচনা করছে। এ বিয়েতে আবার বিগড়ে না বসে। মেয়ের মতি গতির কথা কিছু বলা যায় না। কিন্তু এমন ছেলে হাত থেকে চলে গেলে সারাটা জীবন আফসোস করতে হবে। মন ভেঙে যাবে মেয়ের। আর কাউকে হয়তো মনে ধরবে না।

চোখ বুজতেই পর্দার ছবির মতন কাজলের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঠিক এমনি ব্যাপার নিয়ে আরএকবার আলোড়ন উঠেছিল সংসারে।

ঘর বাঁধতে চেয়েছিল কাজল, মনের মানুষকে নিয়ে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। বাধার প্রাচীর ঠেলে সে এগোতে পারেনি। সংসারের সবাই মিলে জোট বেঁধে দাঁড়িয়েছিল তার বিরুদ্ধে। তার স্বার্থান্ধতার নিন্দা করেছিল। খড়কুটো দিয়ে নিজের বাসাই শুধু সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছে কাজল, আশ পাশের কারুর কথা ভাবছে না।

কিন্তু আজ একই ঘটনা, সেই নীড় বাঁধারই পুনরাবৃত্তি, অথচ সবাই খুশিতে ডগমগ। আনন্দের ছায়া মন্টুরও দুটি চোখে। বাণী তো লজ্জায় মুখই তুলতে পারে নি। নবতারা বুঝি পারলে প্রতি-বেশীদের ডেকে ডেকে এমন একটা আনন্দের সংবাদ শোনায়।

বাণী আর কাজলে অনেক প্রভেদ। কাজল এ সংসারের ভারবাহী পশুর সামিল। সে সরে গেলে সংসার টলমল করবে, অনাহারে কুঁকড়ে যাবে অনেকগুলো দেহ। তার রোজগারে হেলান দিয়ে রয়েছে গোটা সংসার। তার হৃদয়, মনের কোমল বৃত্তি সব

কিছু নিষ্পেষিত করে এ সংসারের প্রাণরস আহরিত হচ্ছে। তাই কাজলের মুক্তি নেই। সরে যাবার কোন উপায় নেই।

অনেক রাত অবধি কাজল বিছানায় ছটফট করল। একবার উঠে কপালে মুখে জলের ছিটে দিল। মনকে বোঝাল। পাত্র হিসাবে অরবিন্দর কোন খুঁত নেই। বাণীর জন্য এমন পাত্র জোগাড় করা কাজলের সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া এমন পাত্র বাঁধবার জন্য যে সোনার দড়ির প্রয়োজন, তা কাজলের নেই। কোন দিক থেকেই আক্ষেপের কিছু নেই। মন যাচাই করেছে দুজনে, নির্ভর করেছে পরস্পরের ওপর। সামাজিক কোন বাধা নেই, কূল ভাঙার প্রশ্ন নয়, কোন দিক থেকে এ মিলনে বিঘ্ন আসার সম্ভাবনা নেই।

সবই মানল কাজল। কিন্তু কিসের জন্য এ লুকোচুরি। কাজলকে মনের কথা একবার বলবার প্রয়োজন মনে করল না নবতারা। বললে কি বাধা দিত কাজল? বাণীর বিয়ে হবে, তাতে কি কাজলের অসাধ!

ঘুম থেকে উঠে কিন্তু কাজলের মন আশ্চর্য ঝরঝরে হয়ে গেল। আগের রাতে আবোল তাবোল সব চিন্তা করার জন্য নিজের ওপরই রাগ হল। এ যেন সাপিনীর নিজের দেহে ছোবল দেওয়া, বিষ ঢালা নিজের লোমকূপে।

অরবিন্দর মত ছেলে আজকাল দুর্লভ। অনেক তপস্যা করেছে বাণী, অনেক পুণ্যের জোরে কাছে পেয়েছে অরবিন্দকে।

কলেজের ক্লাস সেরে বেরিয়ে আসার মুখেই অরবিন্দর সঙ্গে দেখা হল। সে করিডরে অপেক্ষা করছিল।

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে কাজলদি।

কি বল? কাজল দাঁড়িয়ে পড়ল।

এখানে নয়, আপনি তো টিউশনি করতে যাবেন, যেতে যেতেই বলব।

রাস্তায় পা দিয়ে কাজল বলল, ছুটির পর ভিড়ে আমি ট্রামেবাসে উঠতে পারি না অরবিন্দ, এটুকু রাস্তা হেঁটেই যাই।

অরবিন্দ একবার মুখ তুলে কাজলের দিকে চাইল, তারপর বলল, চলুন, হেঁটেই যাই তবে।

পাশাপাশি চলতে চলতে অরবিন্দ কথাটা বলল।

আপনি কি খুশি হননি কাজলদি ?

হয়েছি ভাই, বিশ্বাস কর।

কিন্তু কাল আপনার মুখ চোখের চেহারা ভাল ঠেকল না কাজলদি।

কাজল হাসবার চেষ্টা করল, তোমার কাজলদির মাথায় একটা পোকা আছে অরবিন্দ, সময় অসময়ে সেটা কিলবিল করে ওঠে। কিন্তু কাল তোমার ইঙ্গিতটাও তো খুব প্রীতিপদ ঠেকেনি অরবিন্দ।

কোনটা ? অরবিন্দ ভ্রূ কোঁচকাল।

সেই যে আমার পরিবারে এরকম ঘটনা ঘটতে না দেওয়ার কথাটা।

অরবিন্দ মাথা নিচু করল।

কি, উত্তর দাও ?

আমি কিছু কিছু জানি কাজলদি।

সেটা কতটুকু তাই আমি শুনতে চাই। শুনলেই বা কার কাছ থেকে। বাণীর কাছ থেকে তো নয়ই, মার কাছ থেকে কি ?

না, আপনাদের বাড়ির কোন লোকের কাছ থেকে নয়।

তবে ?

দিলীপদার মুখ থেকে।

দিলীপের মুখ থেকে ! পরিবেশ ভুলে কাজল চেঁচিয়ে উঠল।

পথচলতি লোক দু' একজন ফিরে দেখল। ঠোঁট মুচকে হাসল কয়েকজন।

হাঁ, দিলীপদা দাদাকে একদিন বলছিলেন, আমি পাশের ঘর থেকে শুনেছি। সেইটুকু হয়তো আমার অন্যায় হয়েছে কাজলদি।

ঠোঁটের ওপর জমে থাকা বিন্দু বিন্দু ঘাম কাজল আঁচল দিয়ে মুছে নিল। কথাটা যখন শুরু হয়েছে, তখন শেষ পর্যন্ত জানা

দরকার। মাটি খুঁড়ে খুড়ে মূলের অনুসন্ধান। প্রথম জড়তা কেটে গেছে, আর কোন সঙ্কোচ নেই।

কতটুকু শুনেছিলে অরবিন্দ?

অরবিন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল।

চৌরাস্তার মোড়। ফুটপাথের ওপর পসার সাজিয়ে বসেছে হকাররা। পা ফেলাই দুষ্কর।

আমি আর যাবনা কাজলদি, এখান থেকেই চলি।

কাজল মুখ টিপে হাসল। বলল, উত্তরটা কিন্তু এখনও পাই নি।

অরবিন্দ অন্য দিকে মুখ ফেরাল। যেন ল্যাম্পপোষ্ট কিংবা ট্রামের লাইনকে সম্বোধন করছে এইভাবে বলল, সংসার আপনার পথ আটকেছে। আপনার পক্ষে এগিয়ে আসা সম্ভব হয় নি। আপনাদের মিলনে এটাই একমাত্র বাধা।

মাথা নিচু করেও কাজল টের পেল সারা দেহের রক্ত মুখে এসে জমেছে। দু' চোখে আগুনের দাহ।

মুখ তুলে কথা বলতে গিয়েই কাজল অবাক। অরবিন্দ নেই। চোখ তুলে দেখল অরবিন্দ তীরবেগে ভিড় ঠেলে রাস্তার ওপার দিয়ে ছুটেছে। কোন দিকে দৃষ্টি নেই।

দিন সাতেক পর। ছুটির দিন।

কাজল নবতারার সঙ্গে বাণীর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল, অরবিন্দ এসে দাঁড়াল।

কি খবর অরবিন্দ?

একটা কথা আছে কাজলদি।

কাজল উঠে এসে দাঁড়াল। নবতারা সরে গেল সেখান থেকে।

দিলীপদাকে দুখানা চিঠি দেওয়া হল, একখানারও উত্তর নেই। আমি দিয়েছি, দাদাও দিয়েছেন।

কাজল দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল, ওখান থেকে অন্য কোথাও সরে যাননি তো?

কি জানি, কিন্তু তাহলে খবর একটা দিতেন। এমন তো কোনবার হয় না।

হঠাৎ কথাটা কাজলের মনে পড়ে গেল, অসুখ বিসুখ নয় তো?

সেই কথাটাই ভাবছি। অসুস্থ হয়ে পড়লে দেখবার আর কোন লোকও তো নেই। একটা টেলিগ্রাম করে দেখি আজ। বিয়ের ব্যাপারটা তাঁকে জানিয়েছিলাম। আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলাম, আসতেও লিখেছিলাম।

অরবিন্দ চলে যেতেই কাজল নিজের বিছানার ওপর এসে বসল। দু'হাতে মাথা টিপে।

অরবিন্দকে কিছু জানায় নি। নিজেও একটা চিঠি লিখেছে দিলীপকে। বাণী আর অরবিন্দর সব কথা জানিয়ে। সে চিঠিরও আজ পর্যন্ত কোন উত্তর নেই।

এমনও হতে পারে এসব ব্যাপারে কোন মতামত দিলীপ দিতে চায় না। ঘরপোড়া গরু বলেই রাঙা মেঘে এত ভয়। তাছাড়া সেও তো এমনি করেই হাত বাড়িয়েছিল কাজলের দিকে। এমনিই মন জানাজানির পালা শেষ করে কাজলকে নিয়ে ঘর বাঁধার সঙ্কল্প জানিয়েছিল।

সংসারের দোহাই দিয়ে কাজল সরে গিয়েছিল। সে আঘাত আজও ভোলেনি। কিন্তু দিলীপের মত না পেলে মনে সান্ত্বনা পাবে না কাজল। এ শুভ কাজে কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক থেকে যাবে। দিলীপ নিজে এসে দাঁড়াতে না পারুক. নব দম্পতীকে ঘিরে থাকবে তার শুভকামনা।

কলেজ থেকে বেরোবার মুখেই অরবিন্দর সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ ধরে কলেজের গেটে অপেক্ষা করছিল। উস্কোখুস্কো চুল, পাণ্ডুর মুখ।

কি, শরীর খারাপ নাকি?

শরীর ঠিক আছে কাজলদি। কিন্তু দিলীপদার কাছ থেকে টেলিগ্রামের কোন উত্তর পেলাম না। ওঁর দিক থেকে সাড়া না পেলে আমি সাহস পাচ্ছি না।

তোমার কি মনে হয় উনি আপত্তি করতে পারেন ?

আপত্তি ? না তাই বা কেন করবেন, অরবিন্দ মাথা নিচু করে পথের ওপর পা ঘসল, তারপর বলল, সে সব কিছু নয়। আমার মনে হয় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিদেশ বিভুঁই, তার ওপর উদয়াস্ত পরিশ্রম।

হাতের মুঠোয় কাজল নিজের আঁচল চেপে ধরল। সমস্ত শরীর ত্নলছে। না না, মিথ্যে হোক অরবিন্দের কথা। মানুষটা সুস্থ থাকুক।

আমি কাল রওনা হব কাজলদি।

কোথায় ?

রাজস্থান। দিলীপদার সঙ্গে দেখা করব। মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে। নিজে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসব।

অরবিন্দর মন আর কতটুকু চঞ্চল হয়েছে। নিজের মন কাজলের খুলে দেখাবার নয়। বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ চলেছে। মর্মান্তিক যন্ত্রণা।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কাজল কথাটা বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব অরবিন্দ।

আপনি ?

হাঁ, কলেজ বন্ধ। ছাত্রীদের একজনের পরীক্ষা শেষ, আর একজন বাইরে গিয়েছে। কোন অসুবিধা নেই।

প্রথমটা নবতারা একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু যখন শুনল দিলীপের মত ছাড়া এ বিয়েতে কেউ এক পা এগোবে না, তখন নিমরাজী হল।

এখন আর অসুবিধা নেই। মনোজবাবু রোজ এসে খবর নেবেন একবার করে। বাড়ি থেকে একটা ছোকরা চাকর পাঠাবারও বন্দোবস্ত হল।

তুবার গাড়ি বদল। একবার দিল্লীতে, একবার আজমীরে

ভিলওয়ারায় স্টেশন মাস্টারের কাছেই খবর মিলল। এক বাঙালী-বাবু ছিলেন এখানে, মাঝে মাঝে স্টেশনে আসতেন চিঠি পোস্ট করতে। মূর্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। স্টেশন মাস্টারের কাছে এসব জায়গার অতীত কাহিনী শুনতেন, আর কিংবদন্তী। কিন্তু প্রায় এক মাসের ওপর এ জায়গা ছেড়ে চলে গেছেন। মূর্তির সন্ধানে।

কোন এক উটের চালকের মুখে বুঝি কি খবর পেয়েছিলেন। কোথায় গিয়েছেন সে কথা স্টেশন মাস্টার কিছু বলতে পারল না।

সর্বনাশ! তা হলে উপায়। কাজল মাথায় হাত দিয়ে পড়ল।

অরবিন্দ মুস্কিলে পড়ে গেল। সারা রাজস্থান খুঁজে বেড়ান সম্ভব নয়। মূর্তির খোঁজে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দিলীপ তার ঠিক আছে!

সেই উটের চালকের কাছে সন্ধান মিলতে পারে। অরবিন্দ স্টেশন মাস্টারের কাছে তার কথাও জিজ্ঞাসা করল।

স্টেশন মাস্টার মাথা নাড়ল, ভিলওয়ালার বাসিন্দা নয় চালক। বাইরে কোথা থেকে এসেছিল। বাঙ্গালীবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বোধ হয় মূর্তির কথা বলে থাকবে।

স্টেশনমাস্টার কিন্তু আর এক মতলব দিল। বাঙ্গালীবাবু যে বাড়িতে থাকতেন সেখানে একবার খোঁজ করে দেখতে পারে এরা এমনও হতে পারে বাড়িওয়ালাকে বলেও যেতে পারে।

কথাটা কানে যেতেই কাজল ঘুরে দাঁড়াল।

অরবিন্দর দিকে চেয়ে বলল, সেই ভাল অরবিন্দ, সেখানে একবার সন্ধান নিলে হয়। তবে ভরসা কম। যে জাতের মানুষ দিলীপবাবু, এঁরা পিছনে কোন ঠিকানা রেখে যান না।

স্টেশন মাস্টার বাড়িওয়ালার নির্দেশ দিল। সোজা রাস্তা ধরে যে কাপড়ের মিল, তারই পাশে সাদা একতলা বাড়ি প্রেমকুমারী বোথরার। সেখানেই বাঙালীবাবু থাকতেন।

বাড়িওয়ালা নয় বাড়িওয়ালী।

কাজল মুখ টিপে হাসল।

দুজনেই চলতে শুরু করল। মাথার ওপর চড়া রোদ। দু' পাশে বালির স্তূপ। চিক চিক করছে আগুনের স্পর্শে।

বার দুই তিন কড়া নাড়াতেই প্রেমকুমারী বেরিয়ে এল। একমাথা পাকা চুল। পরণে রঙিন ঘাগড়া আর জামা। হাতে, পায়ে, কানে, নাকে অলঙ্কারের বোঝা।

ভাষা যে বিশেষ বুঝল তার মুখ দেখে এমন মনে হল না। তবে মানেটা বুঝতে পারল। তার বাড়িতে যে বাঙ্গালী বাবু ছিল, তার খোঁজে এরা এসেছে।

প্রেমকুমারী কুঁচকে আসা দুটো চোখ দিয়ে দুজনকে নিরীক্ষণ করল কিছুক্ষণ তারপর বলল, বাবু নেই এখানে। অনেকদিন চলে গেছে।

অরবিন্দ হাত মুখ নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করল। চলে গেছে সে খবর তারা পেয়েছে। কিন্তু কোথায়?

ফুলেরা। প্রেমকুমারী চেঁচিয়ে বলল।

ফুলেরা!

হাঁ, প্রেমকুমারী হেসে ফেলল, বাবু পাগল। দিনরাত কেবল ভাঙাচোরা পাথরের টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করত। সময়ে নাওয়া খাওয়া নয়, বিশ্রাম নয়, কেবল মোটা মোটা বই মুখে দিয়ে বসে থাকত চারপাশে পাথরের টুকরো ছড়িয়ে।

কাজল আর অরবিন্দ আর দাঁড়াল না। প্রেমকুমারীকে ধন্যবাদ দিয়ে পথে নামল!

ফুলেরা! অরবিন্দ কাজলের দিকে চাইল।

এতদূর এসে আর ফিরে যাব না অরবিন্দ, যত কষ্টই হোক, দেখা করে যাবই।

গাড়ি ফুলেরা পৌঁছল ভোর নাগাদ। দুপাশে রুক্ষ মরুভূমি। উটের সার। মাঝে মাঝে দু'একটা বুনো খেজুরের ঝোপ।

স্টেশনে নেমেই মুস্কিলে পড়ল। প্ল্যাটফর্মে রাজস্থানীদের

জটলা। ওদের দিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় কথাবার্তা আরম্ভ করল। বেশ উত্তেজনার ভাব। হাতের লাঠি ঠুকে দু'একজন চিৎকারও করল।

কি ব্যাপার কাজলদি, এদের হালচাল তো সুবিধে ঠেকছে না।

চল, স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে তো আশ্রয় নিই।

মাঝপথেই স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা। তিনিই এগিয়ে আসছিলেন, এখানে কোথায় যাবেন আপনারা?

তার আগে একটা কথার উত্তর দিন তো। অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি কোন গোলমাল হয়েছে। এদের চাউনি আর কথাবার্তা ভাল মনে হচ্ছে না।

স্টেশন মাস্টার দুজনকে নিজের কামরায় বসালেন। বললেন, এক বাঙালীবাবুকে নিয়ে একটু গোলমাল হয়ে গেছে কাল দুপুরের দিকে। আপনাদের বাঙালী দেখেই এরা সন্দেহের চোখে দেখছে।

গোলমাল! কি গোলমাল? খুব উদ্বিগ্ন গলা কাজলের।

গোলমাল মানে, এখানে এক বালিয়াড়ীর পাশে একলিঙ্গের মূর্তি ছিল। এখানকার লোকেরা সেই মূর্তি পূজা করত। অনেক দূর থেকে দলে দলে ভক্তরা আসত। সেই মূর্তি বাঙালীবাবু চুরি করে নিয়ে গেছে। সবাই ক্ষেপে বাঙালীবাবুর বাড়ি চড়াও হয়ে মারধোর করে সে মূর্তি আবার কেড়ে এনেছে।

স্টেশন মাস্টারের কথা শেষ হবার আগেই কাজল উঠে দাঁড়াল। কান্নাভেজা গলায় বলল, সেই বাঙালীবাবুর কুঠিটা দয়া করে দেখিয়ে দেবেন আমাদের। পায়ে পড়ি আপনার। দয়া করে কোথা দিয়ে যেতে হবে সেটা বলে দিন।

কাজলের সঙ্গেও স্টেশন মাস্টারও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার পয়েণ্টসম্যানকে আপনাদের সঙ্গে দিচ্ছি। যদি পারেন সেই বাঙালীবাবুকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। লোকেরা বড্ড ক্ষেপে আছে। আমি

নিজে রাজপুত। ধর্ম বিশ্বাসে কেউ আঘাত করলে আমরা পাগল হয়ে যাই। এদের মনের অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

পথ ঘাট নেই, কেবল বালির স্তূপ। ছায়ার সামান্য আঁচড়ও নয়। কাজল বার বার থেমে পড়ল। আঁচল নিয়ে ঘাম মুছে আস্তে আস্তে এগোল।

অনেকদূর থেকে দেখা গেল। লাল টালির ছাদ। পাথরের দেওয়াল।

পয়েণ্টস্‌ম্যান দূর থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েই পিছন ফিরল। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে সঙ্গে এসেছিল। পথে একটি কথারও উত্তর দেয়নি।

কাজল ছুটে এগিয়ে গেল।

ঠিক বেড়ার ধারে খেজুর পাতার ছাউনির তলায় একজন পুলিশ। সিঁড়ির ধারে আর একটি প্রৌঢ়।

কাজল তার সামনে দাঁড়াল, তুমি সুখলাল? বাবু কেমন আছে?

বিস্মিত সুখলাল ঘাড় নাড়ল। কথা কিছুই বুঝল না। শুধু হাত দিয়ে ভিতরের দিকে দেখল।

চৌকাঠ পার হয়ে কাজল ঘরের মধ্যে ঢুকল। ক্যাম্পখাটের ওপর দিলীপ শুয়ে। হাতে মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

কাজল দিলীপের মাথার কছে বসে আর্তনাদ করে উঠল, ওগো, আমি এসেছি, একবার চোখ খোল!

দিলীপের সারা দেহ শিউরে উঠল। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করল একবার, তারপর আস্তে আস্তে বলল, কে, কাজল? তুমি? আমার চোখের ব্যাণ্ডেজটা একটু সরিয়ে দাও কাজল, তোমাকে দেখি!

কাজল আর অরবিন্দর পিছন পিছন পুলিশও চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছিল। কাজলের দিকে ফিরে বলল, চোখে কোন চোট লাগেনি। ব্যাণ্ডেজটা একটু তুলে দিতে পারেন।

ব্যাণ্ডেজ সরাতে দিলীপের চোখ পড়ল অরবিন্দর দিকে।

ম্লান হেসে বলল, তোমার প্রথম চিঠি আমি পেয়েছি অরবিন্দ। কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্। ভেবেছিলাম এখানে এসে একটা উত্তর দেব, কিন্তু গোলমালে পড়ে আর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

কাজল হেঁট হয়ে হাত বুলিয়ে দিল দিলীপের মাথায়। তারপর বলল, কি সর্বনাশ তুমি করতে বসেছিলে বল তো? মূর্তি দেখলে তোমার বুঝি আর জ্ঞান থাকে না! এদের উপাস্য একলিঙ্গের মূর্তি নিয়ে টানাটানি করেছ?

দিলীপের ভ্রূ কুঁচকে গেল। আরক্ত হয়ে উঠল সারা মুখ। থমথমে গলায় বলল, তুমিও ওদের সুরে সুর মেশাবে কাজল! ওটা একলিঙ্গের মূর্তি মোটেই নয়। মূর্তিটা ওরা কেড়ে নিয়ে গেছে, নইলে তোমাকে দেখাতে পারতাম, পারস্যের ভাস্কর্যের অদ্ভুত ছাপ ওই মূর্তিতে। কিছুটা অংশ ভাঙা, কিন্তু বেশ বোঝা যায় ও মূর্তি মোটেই একলিঙ্গের নয়। রাজস্থান সাদা পাথরের দেশ, এখানে কাল পাথরের মূর্তি এল কোথা থেকে?

ও, এবার বুঝেছি, কাজল মুখ নিচু করে প্রায় দিলীপের কানে কানে বলল কথাগুলো, সেই জন্য ওই মূর্তির ওপর তোমার এত ঝোঁক। এর জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন করতে চলেছ।

কি জন্য? দিলীপের গলায় বিস্ময়ের আমেজ।

কালোর ওপর তোমার যে কি অদ্ভুত টান, তাতো আমি জানি। তাই বুঝি লোকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসতে একটুও দ্বিধা কর নি! মূর্তির বেলা কোন দ্বিধা নেই, যত দ্বিধা মানুষের বেলা?

রঙের হোলিখেলা দিলীপের মুখে। হাত দিয়ে কাজলের একটা হাত চেপে ধরল। মুখে শুধু বলল, কাজল!

অরবিন্দ দাঁড়িয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছিল। এবার দুজনেই ঘরে ঢুকল।

পুলিশ এগিয়ে খাতা খুলে লিখতে লিখতে বলল, অরবিন্দবাবুর পরিচয় পেয়েছি। উনি দিলীপবাবুর ভাই। আপনার পরিচয়টাও আমার দরকার। আজ বিকেলের গাড়িতেই যাতে আপনারা

যেতে পারেন সে বন্দোবস্ত করে দেব। এঁকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই প্রয়োজন।

পুলিশ কাজলের দিকে চাইল। দিলীপও মুখ ফেরাল কাজলের দিকে। পরিচয় দেবার ঝক্কি অরবিন্দ নিজের ওপর নেয় নি, কাজলের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে।

আমার নাম কাজল দেবী। কাজল পরিষ্কার গলায় থেমে থেমে উচ্চারণ করল।

আপনার নাম এঁর কাছে শুনেছি। দিলীপবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ?

দু'এক মিনিট একটু বিব্রত ভাব। কিন্তু সে ভাব সামলে নিল কাজল। এক হাত দিয়ে শাড়ির আঁচল মাথার ওপর তুলে দিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে পুলিশের দিকে চোখ তুলে চাইল, অল্প হেসে বলল, কি সম্পর্ক বলি বলুন তো ? এমন মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখা উচিত নয়।

পুলিশ কি বুঝল কে জানে! মাথা নিচু করে হাসি চেপে খাতায় নোট করে নিল।

কাজলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দিলীপ তার দিকে ফিরে চাইল।

জানলা দিয়ে রোদের আভা এসে কাজলের মুখে পড়েছে। পরিশ্রমে, উৎকণ্ঠায়, লজ্জায় মুখে অপরূপ লাবণ্য। এ লাবণ্য দেহের নয়, মলিন ত্বকেই এর প্রকাশ নয়, এর উৎস বুঝি আরো গভীরে!

একটা হাত বাড়িয়ে দিলীপ কাজলের একটা হাত টেনে নিল।

মূর্তিটা নিজের কাছে দিলীপ রাখতে পারেনি। ভক্তের দল অন্যায় দাবী করে সে মূর্তি ছিনিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এ মূর্তি হারাবার ভয় আর তার নেই। নিকষ কালো পাথরের অপূর্ব মমতাময়ী মূর্তি।
